পালানোর উপায় নেই

মুহাম্মাদ নূরে আলম

উৎসর্গঃ

নির্লোভ ও দুনিয়াত্যাগী মানবপ্রেমী আধ্যাত্মিক সাধকদের চরণে। বিশেষ করে পারস্যের ভুমিতে শায়িত মহান আধ্যাত্মিক সাধক ও রাসূলের(সা.) অষ্টম পুরুষ হযরত আলী ইবনে মুসা আর রিযার(আঃ) সমাধিতে।

এই বইটি মুস্তাবসেরিন বিশ্ব কেন্দ্র ওয়েব সাইট কর্তৃক আপলোড করা হয়েছে।

https://al-mostabserin.com/bangla

অবতরণিকা

"এ উট সবার দুয়ারে একদিন আসবে "-এটি একটি ফারসী প্রবাদবাক্য। এর পেছনে একটি ঐতিহাসিক কাহিনী লুকায়িত আছে। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) যখন তাঁর জন্মস্থান মক্কা নগরী ত্যাগ করে ইয়াসরেব তথা মদিনায় উপস্থিত হন তখন মদিনার জনগণ প্রত্যেকে নবীকে নিজের অতিথি হিসেবে পাবার জন্যে প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হয়। তারা কোন একক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারলে মহানবী (সা.) নিজের উটকে ছেড়ে দিয়ে বললেন এ উট যে বাড়ির সামনে গিয়ে বিশ্রাম নেবে সে বাড়িতে তিনি মেহমান হবেন। শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল। আর এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পারস্যের ফারসী ভাষায় গড়ে ওঠেছে উক্ত প্রবাদ বাক্যটি।

এ প্রবাদটিতে একটি গভীর অর্থ ও ব্যাখ্যা বিরাজমান। ফারসী ভাষীরা যখন কোন কিছুর আগমন কারো জন্যে অবধারিত ও নিশ্চিত বলে ধারনা করেন তখন উক্ত প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহার করে থাকেন। প্রতিটি প্রাণীর জন্যে এ পৃথিবীতে জীবন জীবিকার একটা নির্দ্দিষ্ট সময়সীমা এটে দেয়া আছে। তাই স্বভাবতঃ মানুষেরও আয়ুষ্কাল সীমিত। এ পৃথিবী ছেড়ে তাকে পরপারে পাড়ি জমাতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই। মৃত্যু তার প্রতিনিয়ত সঙ্গী। এ কারণে পারস্যে যখন কেউ মৃত্যুর এ অবধারিত ব্যবস্থাপনার ব্যাপারটি বোঝাতে চান তখন তিনি এ প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহার করে থাকেন। এখানে মৃত্যুকে ঐ উটের সাথে তুলনা করা হয়েছে যা এক সময় সবার দুয়ারে গিয়ে পৌছবে।

যে মৃত্যু আমাদের নিত্য মুহূর্তের সাথী সেই মৃত্যুকে আমরা আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে দেয়ার চেষ্টা করি । অথচ এ মৃত্যুর কথা আমরা স্মরণ করি বা না- ই করি তা আমাদের সকলের দুয়ারে একদিন হানা দেবেই। আমরা নিজেদেরকে আপাততঃ ফাঁকি দিলেও মৃত্যুকে ফাঁকি দেয়ার কোন জো নেই।

মৃত্যু এবং পরকালের হিসেব নিকেশের স্মরণ একজন মানুষকে তার দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করে সমাজে গঠনমূলক ও উপকারী অনেক কাজের অবদান রাখতে অনুপ্রেরণা যোগায়। আজকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যে সকল অন্যায় অবিচার ও পাপাচার বিদ্যমান তার মুলৎপাটনও

ঘটাতে পারে উক্ত বিষয়ে স্মরণ। আর এ কথা ভেবেই মহাপুরুষদের জীবনী থেকে নির্বাচিত উপদেশবাণী সম্বলিত বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে একটি পুস্তক রচনা করার চেষ্টা করেছি। এখানে আত্ম উন্নয়নমূলক শিক্ষার বিষয়টিও প্রতিটি কাহিনী নির্বাচনে সাহায্য করেছে। পাঠক মহোদয়রা যেন অতি সহজে প্রতিটি কাহিনী থেকে গঠনমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন সেজন্যে প্রতিটি গল্পে কিছু লাইন বোল্ড করে দেয়া আছে। তারা অল্প পরিশ্রমেই গল্পের আসল শিক্ষা সেখান থেকে খুজে নিতে পারবেন। তাই এ বই পড়ে যদি কোন পাঠকের সামান্যতম গঠনমূলক কোন উপকারে আসে এবং তিনি নিজের সংশোধনে মানুষের জন্যে অবদান রেখে যেতে পারেন তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

মুহাম্মাদ নূরে আলম-

শেখ সা'দির বাণী

পারস্যের মরমী কবি হযরত শেখ সা'দি (রহঃ) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'গুলিস্তান' -এ লিখেছেন : "দুই ধরনের মানুষ অনর্থক কষ্ট স্বীকার করে এবং লাভহীন প্রচেষ্টা চালায় : এক : যে বস্তুসম্পদ সঞ্চয় করে ঠিকই কিন্তু ভোগ করতে পারে না। দুই : যে শিক্ষা অর্জন করে ঠিকই কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করে না" । তিনি আরো বলেন : জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো : আমলবিহীন আলেমের (জ্ঞানী ব্যক্তি) তুলনা কিসের ন্যায়? উত্তরে বলেন : মধুবিহীন মৌমাছির ন্যায়। তিনি বলেন : মৃগনাভী কস্তুরী তো, যার সুগন্ধি মানুষকে বিমোহিত করে, সুগন্ধি বিক্রেতা বললেই তা মৃগনাভী কস্তুরী হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি সুগন্ধি সংরক্ষিত কাঠের বাক্সের ন্যায় নিশ্চুপ, আর মূর্খ ও প্রদর্শনমুখী ব্যক্তি ঢোলের মত বেশী বাজে কিন্তু ভিতর শূন্য।"

(০১)

লজ্জা

“হাবসা (ইথিওপিয়া) অধিবাসী এক ব্যক্তি রাসূলে খোদা (সা.)- এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো : “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পাপ অনেক। আমার জন্যেও কি তাওবার দ্বার খোলা আছে?”

দয়াল নবী (সা.) বললেন : “হ্যাঁ, তাওবার দরজা সবার জন্যে খোলা। তুমিও তা থেকে উপকৃত হতে পারো।”

অতঃপর হাবসী লোকটি সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহর রাসূলের (সা.) কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজ দেশে চলে গেল।

কিছুদিন পরের কথা। সে লোকটি পুনরায় নবীর (সা.) কাছে ফিরে এলো। এবার এসে সে নবীকে (সা.) জিজ্ঞেস করলো : “ইয়া রাসুলালাহ! আমি যখন গুনাহ্ করতাম তখন কি আল্লাহ আমাকে দেখতেন?”

আল্লাহর নবী (সা.) উত্তরে বলেন : “জি হ্যাঁ, দেখতেন।”

হাবসী লোকটি মহানবীর এ কথা শুনে বুক থেকে শীতল নিঃশ্বাস ফেলে বললো : “তাওবা পাপের অপরাধ মোচন করতে পারে। গুনাহকে পর্দা দিয়ে ঢেকে দিতে পারে। কিন্তু এ কারণে আল্লাহর কাছে যে লজ্জা পেয়েছি তার কি হবে?”[১]

(০২)

জাহান্নামী কে?

[হযরত জা'ফর ইবনে ইউনুস) রহ (:শিবলী নামে ছিলেন সুপরিচিত। তিনি ২৪৭ হিজরীতে জন্মগ্রহন আর ৩৫৫ হিজরীতে চিরস্থায়ী আবাস পানে গমন করেন। হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দিতে এ বিখ্যাত অধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন বহুল আলোচিত। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক

জগতের মহাসাধক হযরত জুনাইদে বাগদাদী) রহ- (:এর শিষ্য। তাঁর পরবর্তী সময়ে নামকরা বহু সাধকের গুরু ও ওস্তাদও ছিলেন তিনি।- [

হযরত শিবলী (রহ:) যে শহরে বাস করতেন সেখানে তাঁর বহু সমর্থক এবং অনেক বিরোধী লোকও ছিলো। অনেকে তাকে প্রচন্ডভাবে ভালবাসতেন আবার অনেকে তাকে শহর থেকে নিষ্ঠুরতার সাথে বহিস্কারেরও চেষ্টা করতেন। সে শহরে তাঁর অসংখ্য ভক্তদের মধ্যে এমন একজন রুটি তৈরীকারকও ছিলো যে হযরতকে কখনো চোখে দেখেনি তবে তার নাম শুনেছে মাত্র।

একদিন সাধক সেই রুটি প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতার দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে আর কোন উপায়ন্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত এক রকম বাধ্য হয়েই সেই রুটি বিক্রেতার কাছে এক টুকরো রুটির আবেদন করলেন হযরত শিবলী (রহঃ)। তিনি একটি রুটি ঋণ চাইলেন সেই রুটি বিক্রেতার কাছে। রুটি বিক্রেতা এ ধরনের আবেদন শুনে রেগে আগুন হয়ে গেল। সে এ অচেনা ব্যক্তিকে যা- তা বলে অপমান করে বিদায় দিলো। ক্ষুধার্ত সাধক সেখান থেকে চলে গেলেন।

এ রুটির দোকানে অন্য একজন লোক বসে তামাশা দেখছিল। সে হযরত শিবলীকে চিনতো। লোকটি রুটি বিক্রেতার সামনে এসে বলো : “যদি তুমি হযরত শিবলীর সাক্ষাৎ পেতে তাহলে কি করতে?” রুটি বিক্রেতা : “আমি তাকে অনেক সম্মান করতাম, তিনি যা চাইতেন তাই দু’হাতে তার পায়ে ঢেলে দিতাম।”

লোকটি তাকে বললো : “যে লোকটিকে তুমি কিছুক্ষণ পূর্বে তোমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিলে এবং তাকে এক টুকরো রুটি থেকে বঞ্চিত করলে, তিনি ছিলেন সে- ই শিবলী।” যেই না রুটি বিক্রেতা একথা শুনলো অমনি হায় আফসোস! হায় আফসোস! করতে লাগলো। রুটি বিক্রেতা লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে গেল। মনে হলো কে যেন তার অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। পেরেশান ও বিচলিতভাবে সে ছুটে গেলো হযরত শিবলীর সন্ধানে। অবশেষে অনেক খোজাখোজির পর তাকে এক মরুভূমিতে পাওয়া গেল। রুটি প্রস্তুতকারক আর কোন বাক্য উচ্চারণ না করে হযরতের পা

জড়িয়ে ধরলো। রুটি বিক্রেতা বিনীত স্বরে বলতে লাগলো, ‘হুজুর দয়া করে আপনি ফিরে আসুন। আমি আপনার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করবো। হুজুর দয়া করে আপনি ফিরে আসুন। আমি আপনার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করবো।’ হুজুর নিশ্চুপ! কিন্তু রুটি বিক্রেতা তাঁকে আবারো অনুরোধ করতে লাগলো, ‘হযরত! আপনি অধমের প্রতি কৃপা করুন। একরাত আপনি আমার গরীবখানায় থাকুন। আর আমি এই গৌরবময় তৌফিকের কারণে আল্লাহর শোকরগুজারস্বরূপ অনেক মানুষকে খাবারে নিমন্ত্রণ করবো। অনুগ্রহ করে আপনি আমার এই আকুতি প্রত্যাখ্যান করবেন না।’ এরকম আকুতি মিনতি দেখে এবং তাঁর কারণে অনেক মানুষ খেতে পারবে ভেবে অবশেষে হুজুর রুটিওয়ালার দাওয়াত গ্রহণ করলেন।

দিন শেষে রাত্রি ঘনিয়ে আসলো। রুটিওয়ালার গৃহে খাবারের বিশাল আয়োজন। শতশত মানুষ তার দস্তরখানার চার পাশে জমায়েত। রুটি বিক্রেতা একশত দিনার এই মেহমানদারিতে খরচ করলো। সে তার ঘরে হযরত শিবলীর অবস্থানের সংবাদ উপস্থিত জনতাকে অবহিত করতে ভুললো না।

হযরত শিবলী নৈশভোজে শরিক হলেন। সকলে আহারে ব্যস্ত। হযরত শিবলী ছাড়াও অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক সাধক। তিনি হযরতকে প্রশ্ন করেন : “ইয়া শেখ! আপনি বলে দিতে পারবেন দোযখবাসী ও বেহেস্তবাসীর আলামত কী?”

জবাবে হযরত শিবলী (রহঃ) বলেন : “জাহান্নামী ঐ ব্যক্তি, যে একখণ্ড রুটি আল্লাহর রাহে দান করে না অথচ শিবলীর মত আল্লাহর এক অপারগ ও অসহায় বান্দার জন্যে একশত দিনার খরচ করতেও দ্বিধাবোধ করে না, আর জান্নাতীরা কিন্তু এরকম নয়।” [২]

(৩)

উপকারী কাজ

পীর সাহেব তাঁর মুরীদদের জিজ্ঞেস করেন : “তোমরা কি এমন কোন কাজ আঞ্জাম দিয়েছো যা থেকে অন্যেরাও উপকৃত হয়েছে? ” হুজুরের কথা শুনে মুরীদদের মধ্যে একজন বলে উঠলো : “আমি ছিলাম একজন আমির- বাদশাহ্। একবার একটি ভিক্ষুক আমার বাড়িতে সাহায্যের জন্য আসে। আমি আমার বাদশাহী পোশাক ও আংটি পড়িয়ে তাকে আমার সিংহাসনে বসিয়ে দিলাম। আর আমি সবকিছু ছেড়ে দরবেশী পোশাক পড়ে আল্লাহর সাধকের পথ ধরলাম।”

অন্য একজন মুরীদ বললো : “আমি এক সময় একটি জায়গা দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। দেখলাম সাধারণ মানুষেরা একজন লোককে আটক করেছে। লোকেরা তার হাত কাটার সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত করে ফেলেছে। সেখানে আমি নিজের হাত উৎসর্গ করে লোকটিকে মুক্ত করলাম। আর দেখুন এই যে আমার এক হাত নেই।”

এতক্ষন পীর সাহেব নিশ্চুপ ছিলেন। তিনি মুরীদদের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনছিলেন। তাদের কথা শুনার পর তিনি মুখ খুললেন। তিনি বল্লেন : “তোমরা যা করেছো তা নির্দিষ্ট দু’জন ব্যক্তির জন্যে করেছো। মু’মিন তো সূর্য, তার কাজ সূর্যের তাপের ন্যায় - যা সকলের জন্যে উপকারে আসে এবং কেউ তা থেকে বঞ্চিত হয় না। তোমাদের মধ্য থেকে কি এমন উপকারী কাজ আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌছেছে?” মুরীদরা হুজুরের এমন কথা শোনে নির্বাক হয়ে মাথা নিচু করে রইলো।[৩]

(০৪)

ভিতরে আসতে বাধা

এক কাফের ব্যক্তির একজন মুসলমান দাস ছিল। দাস তার নিজ ধর্মে ছিল অত্যন্ত দৃঢ় ও প্রত্যয়শীল। কাফের লোকটি তাকে ধর্মের কাজে কোনরূপ বাধা প্রদান করতো না।

একদিন মনিব তার গোলামকে বললো : "গোসল কারার সরঞ্জাম প্রস্তুত কর, গোসল করার জন্যে হাম্মামের দিকে রওয়ানা হতে হবে।" তারা যাত্রা শুরু করলে পথিমধ্যে একটি মসজিদের সাক্ষাত পেলো।

দাস বললো : "মনিব মহাশয়! আমাকে কী একটু অনুমতি দিবেন, আমি মসজিদের ভিতরে গিয়ে নামাজ আদায় করে আসি।"

মনিব বললো : "যাও! তবে যখনি নামাজ শেষ করবে তাড়াতাড়ী ফিরে এসো। আমি এখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।"

মসজিদে জামায়াত সমাপ্ত হয়েছে। ইমাম সাহেব ও অন্যান্য মুসল্লিরা সকলে এক এক করে বাইরে চলে এসেছে। মনিব বেরিয়ে আসা মুসল্লিদে র মধ্যে তার দাসকে খুজে পাচ্ছে না। এরকম অনেকক্ষন সে ধৈর্যধারণ করলো। অবশেষে তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। তিনি উচ্চ স্বরে চিৎকার করে ডাকলেন : "এ- ই গোলাম, বাহিরে এসো।"

মসজিদের ভিতর থেকে জবাব আসলো : "আমাকে বাইরে আসতে দিচ্ছে না।"

শেষ পর্যন্ত মনিব দেখতে চাইলো কে তার দাসকে বাইরে আসতে দিচ্ছে না। তাই সে মসজিদের দরজার নিকটবর্তি হলো। কাফের মনিব উঁকি মেরে দেখলো মসজিদের ভিতর এক জোড়া জুতা আর একজন মানুষের ছায়া ছাড়া আর কিছুই তার নজরে পড়লো না। সেখান থেকেই সে চিৎকার করলো : "আচ্ছা! কে তোমাকে বাইরে আসতে বাধা দিচ্ছে ?"

মসজিদের ভিতর থেকে দাস উত্তর দিলো : যে আপনাকে ভিতরে আসতে বাধা দিচ্ছে।" [৪]

(০৫)

হুকুমের ব্যাপারে খেয়াল

[আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবেন খাফিফ সিরাজী ছিলেন সোরা পীর সুপরিচিত। তিনি ছিলেন হিজরী চতুর্থ শতাব্দির আধ্যাত্মিক মহা সাধকদের অন্যতম। তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতামালা ও বর্ণিত আলোচনা ও কথোপকথন আধ্যাত্মিক সাধকদের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে আসছে। তিনি সব সময় ভ্রমনে কাটাতেন। তাঁর পিতা কিছুকাল পারস্যের 'ফারস' প্রদেশে বাদশাহী করেছেন। তিনি হিজরী ৩৭১- ১৪ সনে পরলোকগমন করেন। ইরানের সিরাজ নগরীর এক ময়দানে তাঁর মাজার অবস্থিত।]

জনশ্রুতি আছে যে তাঁর এমন দু'জন মুরীদ ছিল যাদের দু'জনেরই নাম ছিল 'আহমাদ' । তাই তিনি একজনকে ডাকতেন 'বড় আহমাদ' আর অপরজনকে ডাকতেন 'ছোট আহমাদ' বলে। তিনি ছোট আহমাদ- এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন এবং তাকে বড় আহমাদের চেয়ে বেশী মহব্বত করতেন। মুরীদদের অনেকেই হুজুরের এই অতি স্নেহ এবং দু'জনের প্রতি তাঁর বৈষম্য ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ছিলো।

একদিন তারা পীরের- এর নিকট আরজ করে বসলো : "হুজুর! বড় আহমাদ তো অনেক কঠোর কৃচ্ছসাধনা করেছে এবং আধ্যাত্মিক সাধনার পরিভ্রমনে অনেক ধাপ অতিক্রম করেছে। কেন আপনি তাকে ছোট আহমাদের চেয়ে বেশী ভালবাসছেন না?"

সেদিন শেইখ শুধু এতটুকুই বলেন : "ঠিক আছে, আমি তোমাদের সামনে ওদের দু'জনের পরীক্ষা নেব। তবেই তো তাদের উভয়ের মর্যাদা ও মাক্বামের স্থান পরিস্কার হবে।" উপস্থিত মুরীদরা মাথা নেড়ে পীরের কথায় সম্মতি জানালো।

একদিন শেইখ বড় আহমাদকে বল্লেন : "আহমাদ! এই উটকে আমাদের ছাদের উপরে নিয়ে যাও।"

বড় আহমাদ বলো : "ইয়া শেখ! উটকে কিভাবে ছাদের উপরে নেয়া সম্ভব?"

শেখ বল্লেন : "আচ্ছা, ওটাকে রেখে দাও। তুমি ঠিকই বলেছো।"

অতঃপর তিনি ছোট আহমাদকে বল্লেন : "এই উটকে আমাদের ছাদের উপর নিয়ে যাও।" ছোট আহমাদ হুজুরের এই হুকুম পেয়ে তৎক্ষনাৎ কোমরে কাছা বাঁধলো। জামার আস্তিন উপরে তুললো। অতঃপর উটের পেটের নিচে গিয়ে তাকে কাঁধে নেওয়ার অনেক চেষ্টা করলো। উটকে ছাদে নিতে পারলো না সে। তার সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। এ অবস্থা দেখে আল্লাহর অলী, সাধক বড় পীর ছোট আহমাদকে হুকুম দিলেন আর চেষ্টা না করতে।

অতঃপর তিনি উপস্থিত মুরিদদের সম্বোধন করে বল্লেন : "যা চেয়েছিলাম তা পরিষ্কার হয়ে গেছে।" মুরিদান সকলে বললো : "যা হুজুরের কাছে পরিষ্কার, তা আমাদের কাছে এখনো অস্পষ্ট।"

শেখ বললেন : "ওদের দু'জনের মধ্যে একজন তার শক্তি ও সামর্থের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছে, আমাদের হুকুমের প্রতি নয়। অন্যজন আমাদের হুকুমের ব্যাপারে খেয়াল রেখেছে, নিজের সামর্থের দিকে নয়।

একজন মানুষকে অবশ্যই তার কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিৎ এবং তা সম্পাদন করার জন্যে আত্মনিয়োগ করা বান্দার একান্ত দায়িত্ব। মনিবের হুকুম পালনে কষ্ট ও অসুবিধার কথা চিন্তা করা অনুচিত। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে এটাই চান যে তারা যেন কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে দ্বিধাহীন চিত্তে তা আঞ্জাম দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। আর বান্দা যখনি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্যে মনোনিবেশ করে তখনি তাঁর নির্দেশ পালন করা হয়ে যায়, যদিও তা সম্পাদন করতে অপারগ হয়।

তবে মনে রাখা দরকার আল্লাহ মানুষের জন্যে কোন অসম্ভব কাজের হুকুম জারী করেন না।" [৫]

(০৬)

ধীশক্তির পরিচয়

[হযরত আবুল কাসেম জুনাইদ বিন মুহাম্মাদ বিন জুনাইদ, উপাধি : সাইয়্যেদুত্ তায়িফাহ্, ইরফান ও আধ্যাত্মিক সাধনার জগতে একজন উজ্জল নক্ষত্র। তিনি শ্রেষ্ঠ বহুল পরিচিত সাধকদের অন্যতম। তিনি আসলে ইরানের নেহাভান্দের অধিবাসী কিন্তু বাগদাদে বসবাস করতেন। তিনি হযরত সারি সাক্কত্বির ভাগ্নে ছিলেন। তিনি ত্রিশ বার পদব্রজে হজ্বব্রত পালন করেছেন। তার তরিকা ও আধ্যাত্মিক সাধনার মূল ভিত্তি ছিলো 'সাহ্ব' বা সতর্কতা ও সজীবতা। এর বিপরীতে হযরত বায়েজিদ বোস্তামির অনুসারীরা 'সুক্র' বা অসর্তকতা ও নির্জিবতাকে তাদের তরিকার মূল ভিত্তি হিসেবে নির্দ্ধারন করেছেন।

সাইয়্যেদুত তায়িফাহ্ তার তরিকায় শরিয়াতের পাবন্দির ব্যাপারে বিশেষভাবে জোড় দিয়েছেন। অধিকাংশ তরিকার সিলসিলা তার নিকট পর্যন্ত গিয়ে পৌছায়। তিনি হিজরী ৩৯৭ সানে এ ধরণি থেকে চির বিদায় গ্রহণ করে তার মা'বুদের সান্নিধ্যে চলে যান।]

বর্ণিত আছে যে, হযরত শেখ জুনাইদের (রহঃ) একজন প্রিয় মুরীদ ছিল, যাকে তিনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন এবং সকলের চাইতে বেশী সম্মান করতেন। এ ব্যাপারটা অনেকের জন্যে হিংসার কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল।

শেখ ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই একদিন তিনি ঐ মুরীদ সম্পর্কে তার অন্যান্য মুরীদদের বললেন : "তার আদব ও ভদ্রতা এবং বোধশক্তি সকলের চেয়ে বেশী। আমরা সে দিকই দৃষ্টি দিয়ে থাকি। আচ্ছা পরীক্ষা করা যাক্, তোমাদের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয় কি না।"

শেখ হুকুম দিলেন বিশটি মুরগী আনতে। অতঃপর বললেনঃ "যাও, তোমরা প্রত্যেকে একটি করে মুরগী নাও। এমন নির্জন স্থানে গিয়ে মুরগীগুলোকে জবেহ করে নিয়ে আস যেখানে কেউ যেন দেখতে না পায়।" বিশজন মুরীদ বিশটি মুরগী নিয়ে চলে গেল।

সকলে মুরগী জবেহ করে শেইখের কাছে হাজির করলো। কিন্তু তার ঐ বিশেষ স্নেহভাজন মুরীদ জবেহ না করে জিবন্ত মুরগীটিই ফিরিয়ে নিয়ে আসলো।

শেখ জিজ্ঞেস করলেন : "কেন মুরগী জবেহ করনি?" মুরীদ বলো : "আমাদের শেখ বলেছিলেন যেখানে কেউ দেখতে না পায় এমন স্থানে মুরগীকে জবেহ করতে। তবে আমি যেখানেই গিয়েছি সেখানেই আল্লাহকে দেখতে পেয়েছি। এমন কোন স্থান খুজে পাইনি যেখানে আল্লাহর উপস্থিতি নেই।"

এবার শেখ তার মুরীদদের সম্মোধন করে বললেন : "তোমরা দেখেছো এর ধীশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিমান আর অন্যদের বোধ শক্তিও তো দেখলে।" তখন সকলে তাওবা করে ঐ মুরীদের সম্মান- মর্যাদাকে বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞান করতে লাগলো।[৬]

(০৭)

প্রেমের খেলা

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) বসে বসে তার দুম্বাগুলোর ঘাস খাওয়া দেখছিলেন। তার এই শত শত দুম্বা এই পাহাড়ী এলাকার দৃশ্যকে আরো বেশী মনোরম করে তুলছিলো। তার আশে পাশে ছোট- বড় পাহাড়, টিলা ও পাহাড়ী জঙ্গল সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান। ইব্রাহিম (আঃ) কি চিন্তা করছিলেন? তিনি কি মনে মনে তার দুম্বার সংখ্যা গণনা করছিলেন? নাকি সৃষ্টিকর্তার বিস্ময়কর সৃষ্টি নিয়ে ধ্যানমগ্ন ছিলেন?

তার দৃষ্টি ছিল এমন একটি বাড়ীর দিকে যেখানে চতুর্দিকে শুধু আলোক রশ্মিই প্রতিফলিত হয়। মনে হয় তিনি কোন গোপন রহস্যের উদঘাটন অথবা ধাঁধার সমাধান করতে চিন্তামগ্ন হয়েছেন। না তার দুম্বা, না সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তাঁরা, না কোন কিছুই তার প্রেমিক হৃদয়ে স্থান করতে পারেনি। শুধুই আল্লাহ। আর আল্লাহ তার প্রনয়সিক্ত মনে অন্য সব সময়ের চেয়ে এ মুহূর্তে আরো বেশী করে অবস্থান নিয়েছিলেন।

দুম্বাগুলো আপন মনে পদচারণা করছিল। কেউ বাধা দেয়ার ছিল না। তবুও ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর আপন মা'বুদ পরওয়ারদেগারের স্মরণ হতে এক মুহূর্তও দূরে সরে আসেননি। হঠাৎ বিকট এক শব্দ এসে তার কর্ণকুহরে আঘাত হানলো। এ শব্দ কোথা থেকে! এটা তো ছিলো তার বহু বছরের আকাঙ্খা! যা শুনার করার জন্যে তার জাতির কাছ থেকে তিনি আশা করেছিলেন। কিন্তু তার জাতির লোকেরা মূর্তি পূঁজা ছাড়া অন্য কিছুই তাকে উপহার দিতে পারেনি। শব্দটি তার কর্ণকুহরে বলে দিচ্ছে এটা তার মা'শুকের নাম। হ্যাঁ, শব্দটি বাতাসের স্পন্দে ভেসে এসে হযরত ইব্রাহিমের মা'শুকের নামটিই উচ্চারণ করছে।

ইয়া কুদ্দুস (হে পুতঃ পবিত্র)! ইয়া কুদ্দুস!

ইব্রাহিম (আঃ) এ নাম শুনে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং এই হৃদয়স্পশী ও মর্মভেদী নামের স্বাদ তার মন- মগজকে এমনভাবে আপ্লুত করে দেয় যে তিনি মুহূর্তের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে যান। যখন তার জ্ঞান ফিরে এলো তখন দেখতে পেলেন একজন লোক এক খণ্ড বড় প্রস্তরের উপর বসে আছেন।

ইব্রাহিম (আঃ) বললেন : "হে আল্লাহর বান্দা! আরেকবার যদি তুমি এ মধুর নাম উচ্চারণ কর তাহলে আমি আমার দুম্বাগুলোর একাংশ তোমাকে দান করে দিবো।" তৎক্ষনাৎ 'ইয়া কুদ্দুসের' ধ্বনিপ্রতিধ্বনি আকাশ- বাতাস মুখরিত করে তুললো। পর্বত ও মরুভূমিতে সবদিকে শুধু শোনা যায় ইয়া কুদ্দুস, ইয়া কুদ্দুস।

ইব্রাহিম (আঃ) এই সীমাহীন সু- স্বাদের সাগরে আবারো ডুব দিলেন। বন্ধুর নাম শ্রবনের আনন্দ তাঁর অস্তিত্বে এমনি প্রভাব বিস্তার করেছে যে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও বহুবার এই নাম শ্রবনের চিন্তা ছাড়া অন্য কিছুই তার মস্তিষ্কে জায়গা করে নিতে পারছিল না। তিনি বললেন : "আবারো এই নাম পড়। আমি আমার দুম্বাগুলোর আরেক অংশ তোমাকে দান করে দিবো।" বল : 'ইয়া কুদ্দুস!' আবারো বল : 'ইয়া কুদ্দুস!' এভাবে হযরত ইব্রাহিমের সকল দুম্বা শেষ হয়ে গেল। তবুও তার অন্তর এই পবিত্র মধুর নাম শোনার জন্যে ব্যকুল হয়ে ওঠে। কোন ক্রমেই তৃপ্তি হচ্ছিল না। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেলো তার দুম্বাগুলো পাহারা দেওয়ার জন্যে যে কুকুর তার সাথে এসেছিল

তার গলায় ঝুলানো আছে একটি সোনালী শিকল। এবার তিনি সে অচেনা লোকটিকে বললেন, আর একবার তার বন্ধুর নাম উচ্চারণ করতে, তাতে তার শেষ সম্বলটুকুও যদি যায় যাক। লোকটি পড়লো : 'ইয়া কুদ্দুস!' পাহাড়- পর্বত সর্বত্র একই নাম প্রতিধ্বনিত হলো। ইব্রাহিম (আঃ) পুনরায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু এবার তাঁর দেয়ার মত আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। কি করে আবার এই মধুর নাম শোনা যায়। এর আনন্দ ও স্বাদের যে শেষ নেই। কি করা যায় ভেবে পেলেন না। আকস্মিকভাবে মনে পড়ে গেল তার শেষ সম্বলের কথা। লোকটিকে তিনি বললেন : "আরেকবার তুমি সে নামটি উচ্চারণ কর। আমার শেষ সম্বল আমার প্রাণ তোমার জন্য উৎসর্গ করে দিবো।"

অচিন লোকটির মুখে মুচকি হাসির রেখা ফুটে উঠলো। আস্তে আস্তে তিনি হযরত ইব্রাহিমের কাছে আসলেন। ইব্রাহিম তো তার মা'শুকের নাম শোনার জন্যে উদগ্রীব। কিন্তু মনে হলো ইব্রাহিমের সাথে সেই লোকটির অন্য কিছু বলার আছে। লোকটি বললেন : "আমি জিব্রাঈল! আল্লাহর নিকটতম ফেরেস্তা। আসমানী জগতে তোমার ব্যাপারে অনেক কথার অবতারণা হয়েছিল। সবাই তোমার কথাই বলতো। অবশেষে আমরা সকলে আল্লাহর কাছে অনুরোধ করেছিলাম, 'হে ইলাহ্, মৃত্তিকার তৈরী তোমার ইব্রাহিম কেন এবং কিভাবে 'খলিলুল্লাহ্ '- এর মাক্বামে পৌছুলো? তখন আল্লাহ আমাকে হুকুম দিলেন তোমার কাছে আসতে এবং তোমাকে পরীক্ষা করতে। এখন আমার কাছে স্পষ্ট যে কেন তুমি আল্লাহর খলিল বা বন্ধু খেতাব লাভ করেছো। কেননা তুমি আশেক, তাই পূর্ণতার শিখরে পৌছেছো। হে ইব্রাহিম! এই দুম্বাগুলো আমাদের কোন কাজে আসবে না। তোমার দুম্বা তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম।"

ইব্রাহিম (আঃ) উত্তর দিলেন : "কোন কিছুকে দান করে সেগুলোকে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়া মহত্বের শর্ত ও মুক্ত মানুষদের নীতি আদর্শ নয়। আমি ওগুলোকে দান করে দিয়েছি। ফিরিয়ে নিতে পারবো না।" হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন : "তাহলে ওগুলোকে যমিনের বুকে ছড়িয়ে দিই। ওরা যেখানে খুশি সেখানে বিচরণ করে বেড়াক। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এই দুম্বাগুলোকে শিকার করবে তারা সবাই তোমার মেহমান।"[৭]

(০৮)

অনুগত দুই দাস

বর্ণিত যে, একদা বাদশাহ্ ইস্কান্দার মাকদুনী (আলেকজান্ডার) বাক্যালাপের উদ্দেশ্যে দিভজান্স- এর খেদমতে আগমন করেন। দিভজান্স ছিলেন একজন নির্জনবাসী ও আধ্যাত্মিক সাধক। বাদশাহ্ ইস্কান্দার তার কাছে গেলে তিনি আশানুরূপ সম্মান পেলেন না। এতে করে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন। বাদশাহ ক্রোধের স্বরে তাকে বলেন : "এটা কি ধরনের আচরণ তুমি আমার সাথে করলে? তুমি মনে করেছো আমার কাছে তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।"
"জি হ্যাঁ, প্রয়োজন নেই।" উত্তর দিলেন সাধক। বাদশাহ্ : "তোমাকে তো অ- মুখোপেক্ষী দেখছি না। মাটির উপর বসে আছো দেখছি আর আসমান তো তোমার ঘরের ছাদ। আমার কাছে কিছু চাও যেন তোমাকে দিতে পারি।"

সাধক : "হে বাদশাহ্! আমার একান্ত অনুগত দু'টি দাস আছে যারা তোমার মনিব। সেহেতু তুমি আমার দাসদেরও দাস।"

বাদশাহ্ : "তোমার যে দাসেরা আমার মনিব তারা কারা?" সাধক : "তারা হলো কাম এবং ক্রোধ। আমি ঐ দু'টোকে নিজের অধীনে এনে দাসত্বের শৃংখল গলায় পড়িয়ে দিয়েছি। আর এরাই তোমার উপর কর্তৃত্ব করছে। তারাই তোমার মনিব। তারা যেদিকে তোমাকে নেয় তুমিও সেদিকে চল। এখান থেকে চলে যাও। এখানে এই দু'য়ের কোন স্থান নেই।"[৮]

(০৯)

শূন্য দরগাহ্

[বায়োজিদ বোস্তামী অবশ্যই হাতে গুনা কয়েকজন আল্লাহর মহান অলী ও অত্যন্ত প্রভাবশালী ইসলামী মহা আরেফ ও সাধকদের মধ্যে গণ্য। হকওয়ালার রাহে মহাপুরুষদের উপর তাঁর অবিশ্বাষ্য প্রভাবের কারণে বিভিন্ন কাহিনী ও বক্তব্য অন্যান্য সকল আরেফ- অলীদের চেয়ে বেশী

বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে। হযরত শেখ ফরিদউদ্দিন আত্তার নিশাপুরী তার বিখ্যাত 'তাযিকরাতুল আওলিয়া' কিতাবে - যাতে আরেফ- অলীদের মাক্বাম- মর্যাদা ও অবস্থার বর্ণনা রয়েছে, সেখানে তিনি সবচেয়ে বেশী হযরত বায়োজিদ বোস্তামীর কথা বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় হিজরীর শেষাংশে বোস্তাম শহরে (যা এখন ইরানের শাহরুদ শহরের কাছাকাছি অবস্থিত) জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং সেখানেই তিনি হিজরী দু'শত একষট্টি সনে ইহলোক ত্যাগ করেন। আজকাল তার মাযার শরীফ আধ্যাত্মিক সাধক ও শিষ্য এবং বহু ভক্তবৃন্দের মিলন কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত। তাঁর সম্পর্কে অনেক কথাই লেখা যায়। এখানে এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্বে এতটুকুই বলতে পারি যে, তিনি বহু কাল ধরে মুসলিম সমাজে ইসলামী ইরফান বা ইসলামী আধ্যাত্ববাদের মডেল হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছেন। কারণ মা'রেফতপন্থি লোকদের মধ্যে তার খ্যাতি ও সুনাম অতুলনীয়। আর এ কারণেই মাওলানা রুমী (রহঃ) তার বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ 'মসনাভীয়ে মা'নাভী' (মাসনভী শরীফ)- তে তাকে হাকিকত ও মহত্ত্বের মডেল এবং পবিত্রতা ও সততার দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণ করেছেন।]

বর্ণিত আছে যে, একদিন এক ব্যক্তি হযরত বায়োজিদ বোস্তামীকে (রহঃ) কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন : "আপনি এই আধ্যাত্মিক উচ্চ মাক্বামে কিভাবে এবং কোন্ পথে পৌছেছেন?"

উত্তরে হযরত বায়েজিদ বলেন : "আমি শৈশবে কোন এক রাতে বোস্তাম নগরী থেকে বেরিয়ে আসি। তখন চন্দ্র আলো বিতরণ করছিল আর পৃথিবী আপন কোলে ছিল ঘুমন্ত। আমি আল্লাহর কুদরতে এমন এক জায়গা দেখতে পেলাম যেখানে আঠারো হাজার পৃথিবী তার সামনে বিন্দুর সমতুল্য মনে হচ্ছিল। তখন আমার অন্তর্জ্বালা আমাকে পীড়িত করে। আর এ কারণে সাংঘাতিকভাবে আমার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। যার ফলে আমি আধ্যাত্মিক সাধনার সুউচ্চ পর্যায়ে পৌছুতে সক্ষম হয়েছি।

সে সময় আমি বলেছিলাম : 'হে আমার প্রভূ! এরকম বিরাট জায়গা আর এরকম বিশাল শূন্যতা!! এরকম বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা আর এভাবে আমাদের কাছে রয়েছে গোপন!!!' তখন অদৃশ্য থেকে

ধ্বনি আসলো : 'আমার দরগাহর শূন্যতার কারণ এই নয় যে, এখানে কেউ আসে না। বস্তুতঃপক্ষে এর কারণ হলো যে, আমি চাই না কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তি এখানে আসুক।' কেননা সে ব্যক্তি এই দরগাহর উপযুক্ত নয়।"[৯]

(১০)

আল্লাহর আতিথেয়তা

কথিত আছে যে একবার এক কাফের ব্যক্তি হযরত ইব্রাহিম (আঃ)- এর নিকট একটু খাবারের আবেদন করলো। ইব্রাহিম (আঃ) বললেন : "যদি তুমি মুসলমান হও তাহলে তোমাকে আমি আমার মেহমান হিসেবে গ্রহণ করতে পারি এবং পেট পুড়ে খেতে দিতে পারি।" এ কথা শুনে কাফের লোকটি কিছু না বলে চলে গেলো। কিছুক্ষন পর আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ইব্রাহিম(আঃ)- এর নিকট অহি আসলো :

"হে ইব্রাহিম ! আমি সত্তুর বছর যাবৎ এ কাফেরকে রুজি দিচ্ছি আর তুমি যদি এক রাতে ওকে খাবার দিতে এবং তার দ্বীন সম্পর্কে প্রশ্ন না করতে তোমার কি ক্ষতি হতো?"

ইব্রাহিম(আঃ) অহির মাধ্যমে আল্লাহর বক্তব্য শুনে অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তিনি সে কাফের ব্যক্তির সন্ধানে ছুটে পড়লেন। অবশেষে অনেক কষ্টের পর তাকে খুজে পেলেন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ঐ কাফেরকে পেট ভরে খাওয়ালেন। খাবার শেষে সেই কাফের লোকটি অবাক হয়ে ইব্রাহিমকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলোঃ "হে ইব্রাহিম! কি হলো যে তুমি তোমার পূর্বের বক্তব্য থেকে ফিরে এসেছো? আর আমার জন্যে খুব সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করেছো?" ইব্রাহিম(আঃ) কাফের লোকটিকে অহি আসার ঘটনা আদ্যপ্রান্ত সব খুলে বললেন। কাফের লোকটি ঘটনাটি শুনে হযরত ইব্রাহিমকে (আঃ) বললো : "যদি তোমার প্রভু এ পরিমান দয়ালু হয়ে থাকেন তাহলে তোমার দ্বীন সম্পর্কে আমাকে অবগত করাও যেন আমিও এরকম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হতে পারি।"[১০]

(১১)

শত্রুর সাথে যাত্রা

[জনাব ইলিয়াস ছিলেন নিশাপুরের আমির এবং প্রধান সেনাপতি। চতুর্থ শতাব্দিতে নিশাপুর পারস্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তম নগরী হিসেবে পরিগণিত ছিল। সেকালে এই শহরের প্রধান সেনাপতির পদটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক।]

একদিন জনাব ইলিয়াস হযরত আবু আলী দাক্কাক নামে এক স্বদেশী অলীর খেদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক হাটু গেড়ে সেই দরবেশের সমনে বসে পড়লেন। অতঃপর তিনি হযরত আলী দাক্কাকের কাছে কিছু উপদেশমূলক নসিহত পেশ করার জন্যে অনুরোধ জানালেন। জনাব ইলিয়াসের অনুরোধে আল্লাহর অলী বলেন :

"আমি তোমাকে উপদেশ দিবো না। তবে আমি তোমার কাছে একটি প্রশ্নের উত্তর আশা করবো। আশা করি তুমি তার সঠিক উত্তর দান করবে।"

সেনাপতি : "ঠিক আছে আপনি জিজ্ঞেস করুন হুজুর। আমি উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো।" হযরত দাক্কান ইলিয়াসের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলেন : "আমি জানতে চাই, তুমি ধন-দৌলতকে বেশী ভালবাস নাকি তোমার শত্রুকে?"

সেনাপতি ইলিয়াস এই প্রশ্ন শুনে বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষন চুপ থেকে চিন্তা করে তিনি উত্তর দিলেন : "ধন- দৌলতকে আমি বেশী পছন্দ করি।" হযরত আবু আলী কিছুক্ষন আত্মমগ্ন অবস্থায় কাটালেন। অতঃপর মাথা তুলে বললেন : "আচ্ছা! যদি এরকমই হয় যা তুমি বললে, তাহলে কেন তোমার পছন্দনীয় জিনিষকে তুমি এখানে ছেড়ে যাচ্ছো। কেন তুমি সেগুলোকে নিয়ে যাচ্ছো না। আর যা তুমি পছন্দ কর না এবং যে তোমার শত্রু তাকেই সাথে নিয়ে যাচ্ছো?" দরবেশের এই কথা শুনে সেনাপতির টনক নড়লো। তার চক্ষুযুগল অশ্রুতে ভরে গেল। কিছুক্ষন এভাবেই অতিবাহিত হল। যখন তার স্বম্বিত ফিরে এলো তখন তিনি দরবেশেকে বললেন :

“আমাকে ভাল উপদেশ দিলেন। আমাকে তন্দ্রা থেকে জাগ্রত করলেন। আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন, আপনি আমাকে হেদায়েতের পথ দেখালেন।”[১১]

(১২)

কোথাও খুজে পাবেনা আমাকে

অবশেষে গ্রীসের প্রাচীন দার্শনিক সক্রেটিসের জন্যে মৃত্যুদন্ডের রায় ঘোষনা করা হলো। তিনি মৃত্যুর পথযাত্রী। দিনক্ষন গুণছেন কখন তার মৃত্যুদন্ড কার্যকরী হবে। এ সময়গুলোতে ভক্তবৃন্দরা তার চতুষ্পার্শ্বে জমায়েত হয়েছেন।

অনেকে তাকে বলছেনঃ “হে মহান দার্শনিক! আপনি আপনার বিশ্বাস থেকে ফিরে আসুন। এতে করে আদালত আপনার মৃত্যুদন্ডের রায় কার্যকর করতে পারবে না।” আবার অনেকে বলেন : “হে মহান! আপনি ফাঁসি থেকে মুক্তির জন্যে আপনার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছু বক্তব্য দিন। যখন আপনার ফাঁসির রায় বাতিল করা হবে তখন আবার আপনি আপনার পূর্ব বিশ্বাসে ফিরে যাবেন।” কিন্তু দার্শনিক অনড়, অবিচল। তিনি কোন কিছুতেই তার বিশ্বাস থেকে চুল পরিমানও পিছু হটতে রাজি নন।

তিনি বলেন : ‘‘আমি যে সত্য বুঝেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি মৃত্যুকে বরণ করতে পারি কিন্তু আমার বিশ্বাস থেকে পিছিয়ে আসতে পারি না। আমি আমার নিজের মুক্তির জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারি না।”

যখন তার ভক্ত মুরীদরা দেখলেন কোন কিছুতেই তাকে মৃত্যুদন্ড থেকে বাঁচানো গেল না তখন তারা কাঁদতে লাগলেন। তাদের মধ্যে একজন অশ্রুভেজা চোখ নিয়ে এ শিক্ষককে বললেন : “এখন যেহেতু আপনাকে ফাঁসি থেকে রেহাই দেয়া গেল না সেহেতু আপনি আমাদের বলে দিন আপনার মৃত্যুর পর আমরা আপনাকে কোথায় এবং কিভাবে সমাহিত করবো?”

ভক্তদের প্রশ্নের উত্তরে দার্শনিক সক্রেটিস বলেন : "আমার মৃত্যুর পর যদি তোমরা আমার নাগাল পাও তাহলে যা মন চায় তাই করো।" শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারলেন ওস্তাদ জীবনের অন্তিম মুহুর্তেও তাদেরকে মা'রেফাত শিক্ষা দিচ্ছেন। তারা উপলব্ধি করলেন যে, মানুষের মৃত্যুর পর যা অবশিষ্ঠ থেকে যায় তা সে নিজে নয় বরং কিছু হাড্ডি- মাংশ বিশিষ্ট একটি মরদেহ - যা দ্রুত দাফন না করলে দূগর্ন্ধ ছড়াতে থাকবে। এ মর দেহ এ জগতেই ছেড়ে যেতে হয়।

সক্রেটিস তাদেরকে এ শিক্ষাই দিলেন যে, মানুষ মৃত্যুর পর এমন স্থানে গমন করে যেখানে জীবিত মানুষেরা পৌঁছুতে পারে না। মানুষের কাছ থেকে যা অবশিষ্ট রয়ে যায় তা তো শুধুমাত্র প্রাণহীন একটি মরদেহ। আর এটা সেই মানুষের (মৃত ব্যক্তির) সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। এ কারণে তিনি তার শিক্ষার্থীদের বলেনঃ "যদি তোমরা আমাকে নাগালে পাও তাহলে যা খুশি করো। অর্থাৎ আমার নাগাল পাবে না।"[১২]

(১৩)

বাদশাহীর মূল্য

[হযরত শাক্কিক বালখী (রহঃ) হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দি ও আব্বাসীয় শাষক হারুন- আর- রাশীদের সমসাময়িক কালের একজন স্বনামধন্য সুফী ও আরেফ ছিলেন। তার শিষ্যদের জন্যে তার সবচে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ছিল তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা)।]

কথিত আছে যে, একদিন হযরত শাক্কিক (রহঃ) হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে বলখ থেকে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি বাগদাদে যাত্রবিরতি করেন। বাদশাহ্ হারুন- আর- রাশিদ তাকে দরবারে ডেকে আনলেন। যখন শাক্কিক বালখী (রহঃ) বাদশাহর নিকট পৌঁছালেন তখন বাদশাহ্ হারুন- আর- রাশিদ জিজ্ঞেস করেনঃ "তুমিই কি সেই শাক্কিক যাহেদ (দুনিয়াত্যাগী)?"

দরবেশ উত্তর দিলেন : "হ্যাঁ, আমি শাক্কিক। কিন্তু যাহেদ নই।"

বাদশাহ্ : "আমাকে উপদেশ দাও।"

দরবেশ : "যদি তুমি উত্তপ্ত মরুভূমিতে পিপাসার্ত হও আর সে কারণে তুমি বাধ্য হও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে, তখন সেই মুহূর্তে যদি কেউ তোমার সামনে পানি এনে উপস্থিত হয়, সে পানি তুমি কত দিনারে কিনবে?"

বাদশাহ্ : "বিক্রেতা যে পরিমান অর্থে সন্তুষ্ট হয়।"

দরবেশ : "যদি তোমার বাদশাহীর অর্ধেক ছাড়া সন্তুষ্ট না হয় তখন কি করবে?"

বাদশাহ্ : "বাদশাহীর অর্ধাংশ তাকে দিয়ে দেবো। বিনিময়ে তার কাছ থেকে পানি নিয়ে তা দিয়ে মরুভূমিতে আমার প্রাণ রক্ষা করবো।"

দরবেশ : "যদি তাতেও তোমার তৃষ্ণা নিবারণ না হয় তখন তুমি কি করবে?"

বাদশাহ্ : "আমার দেশের সকল চিকিৎসকদের ডেকে এনে চিকিৎসা করাবো।"

দরবেশ : "কিন্তু তাতেও যদি কোন কাজ না হয়? শুধুমাত্র একজন চিকিৎসক তোমার অর্ধ বাদশাহীর বিনিময়ে তোমাকে আরোগ্য দান করতে ইচ্ছুক হয় তখন কি করবে?"

বাদশাহ্ : "মৃত্যু থেকে পরিত্রানের জন্যে তার চিকিৎসা বাবদ অর্ধ বাদশাহী দিতে রাজী আছি।"

দরবেশ : "হে হারুন! কিসের জন্যে এতসব বড়াই! যে বাদশাহীর মূল্য এক ঢোক পানি - যা পান করার পর পুনরায় বাইরে নির্গত হয়ে যায় ?" একথা শুনে বাদশাহ্ হারুন- আর- রাশিদ মাথা নত করে রইলেন।[১৩]

(১৪)

উট বাড়ীর ছাদে

[হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দির একজন নামকরা ইসলামী আরেফ ও আল্লাহর অলী এবং খ্যাতনামা দরবেশ হযরত ইব্রাহিম আদহাম। তাঁর সমন্ধে লেখা আছে যে, তিনি যৌবনকালে 'বলখ' রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন এবং তখন তার শান- শওকত ও মর্যাদার কোন কমতি ছিল না। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এ জগতের সকল কিছু ছেড়ে দরবেশের পথ ধরেন। তিনি যোহদ্

ও ইরফানের রাজ্যে বিচরণের শুরুতেই দুনিয়ার সকল কিছু ত্যাগ করেন। তার এই পরিবর্তনের সঠিক ও সুস্পষ্ট কারণ আজ অবধি কেউ অবগত হতে পারেনি। তবে শেখ ফরিদউদ্দিন 'আত্তারে নিশাবুরী' - একজন স্বনামধন্য ইরানী সাধক ও অলী- দরবেশ- তার 'তাজিরাতুল আউলিয়া' - কিতাবে ইব্রাহিম আদহামের ব্যাপারে দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যার দু'টিই পৃথকভাবে আল্লাহর এই অলীর মানসিক ও রুহানী অবস্থার পরিবর্তনের কারণ হিসাবে উলেখ করা যেতে পারে।]

বাদশাহীর আমলে এক রাতে ইব্রাহিম আদহাম পালংঙ্ক বিছিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। হঠাৎ তার প্রাসাদের ছাদের উপর থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলেন। দ্রুত বিছানা ছেড়ে প্রাসাদের ছাদে চলে গেলেন। ছাদে গিয়ে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন একজন সাধা- সিধে মধ্যবয়সী লোক তার ছাদে পায়চারী করছে।

ইব্রাহীম আদহাম জিজ্ঞেস করেন : "তুমি কে?"

লোকটি উত্তর দিল : "জাহাঁপনা! আমি উট হারিয়ে এখানে আপনার ছাদে তাকে খুজছি।"

ইব্রাহীম বললেন : "নির্বোধ! কেউ উট ছাদের উপরে খোজে নাকি? উটের কি পাখা আছে যে তা উড়ে এসে আমার ছাদে বসে থাকবে? উট এখানে কি করে আসবে?"

লোকটি সাদা- মাটা উত্তর দিল : "হ্যাঁ, জাহাঁপনা! ছাদের উপর উটের খোজ নেয়া একটি আশ্চর্য ও অবাক ব্যাপার। আর তার চেয়ে অনেক বেশী বিস্ময়কর হচ্ছে আপনার কাজ। আপনি কি করে সোনালী সিংহাসনে ও চকচকে রেশমী পোশাকে আল্লাহকে সন্ধান করছেন?" লোকটির এ কথায় ইব্রাহীম আদহামের অন্তরে ঢেউ খেলে গেল।

তার এ ছোট্ট অথচ অর্থপূর্ণ কথা হযরত ইব্রাহীমের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করলো যে, তৎক্ষনাৎ তিনি দুনিয়ার সব অর্থ- সম্পদ থেকে নিজের মনকে মুক্ত করে খোলা মরুভূমির পথে যাত্রা শুরু করেন। সেখানে তিনি তার একজন দাসের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তখন তার দাস তারই ভেড়ার পাল দেখাশুনা করছিল। তিনি সেখানেই তার অতি সুন্দর ও মহামূল্যবান পোশাক দাসকে দিয়ে নিজে দাসের গায়ের রাখালি পোশাক পড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান।[১৪]

(১৫)

সরাইখানা

একবার বাদশাহ্ ইব্রাহিম আদহাম দেশের সকল গণ্যমান্য লোকজন, মন্ত্রিবর্গ, উপদেষ্টা পরিষদ ও দাস-দাসী এবং সকল পাইকপিয়াদাকে রাজদরবারে আহ্বান করলেন। রাজার গোলামরা সারিবদ্ধভাবে বুকে হাত রেখে বিনয়ের সাথে দাড়িয়ে আছে। অতিথিবৃন্দ সকলে বলখের মহামান্য বাদশাহর সামনে অবনত মস্তকে দন্ডায়মান। হাঠাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তি কারো কাছে অনুমতি না নিয়েই দরবারে প্রবেশ করলো। ঐ ব্যক্তির ভাব গম্ভিরতা দেখে কারো প্রশ্ন করার সাহস হয়নি যে, 'আপনি কে? এখানে আপনার কি কাজ?' লোকটি সোজা গিয়ে বাদশাহর সামনে উপস্থিত।

বাদশাহ্ ইব্রাহীম চিৎকার দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : "তুমি কি জন্য এখানে এসেছো?" আগন্তুক : "এটা হচ্ছে সরাইখানা আর আমি মুসাফির। সরাইখানা মুসাফিরদের জন্যে বিশ্রামের জায়গা। আমি এখানে এসেছি সামান্য বিশ্রাম নেয়ার জন্যে।"

বাদশাহ্ ইব্রাহীম রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। তিনি বলেনঃ "এটা সরাইখানা নয়। এটা আমার রাজপ্রাসাদ।" লোকটি বললো : "এই বাসস্থান তোমার পূর্বে কার বাড়ী ছিল?" ইব্রাহীম : "অমুক ব্যক্তির ..." আগন্তুক : "তার পূর্বে এই বাড়ীর মালিক কে ছিল?" ইব্রাহীম : "অমুক ব্যক্তির বাবা।" আগন্তুক : "এই যারা এই বাড়ীর মালিক ছিল তারা এখন কোথায়?" বাদশাহ্ : "তারা সকলে মারা গেছে আর এটা এখন আমাদের হস্তগত হয়েছে।" আগন্তুক : "যে বাড়ী প্রতিদিন একেক জনের বাসস্থান, যে বাড়ীতে তোমার পূর্বে অন্যেরা এখানে বসবাস করেছে আর তোমার পরে আরো কত লোক এখানে বসবাস করবে - তা সত্যিকার অর্থে সরাইখানা। কেননা প্রতিদিন, প্রতিটি মুহূর্তে এটা একেক জনের বাসস্থান।"

বাদশাহ্ ইব্রাহীম লোকটির কথা শুনে চিন্তামগ্ন হয়ে গেলেন। তিনি জানতে পারলেন যে প্রতিপালক তাকে এই বাড়ী অথবা অন্য বাড়ীর জন্য সৃষ্টি করেননি। তাকে অবশ্যই আখেরাতের বাসস্থানের চিন্তা করা উচিত, কেননা সেটা যে চিরস্থায়ী আবাসস্থল।[১৫]

(১৬)

নামাজে ঘোড়াকে জলপান

[আবু হামিদ মুহাম্মাদ গাজ্জালী হিজরী পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দির একজন বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ। হিজরী ৪৫০ সনে তিনি ইরানের তুস নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন আর ৫৫ বছরে তিনি ইসলামী জগতে একচ্ছত্র সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইমাম মুহাম্মাদ গাজ্জালীর জীবন ঘিরে ছিল বহুল অলোচিত বিভিন্ন ঘটনাবলী, ভ্রমন, জ্ঞানগর্ভ বিতর্ক ও আলোচনার বাহার। তার এক ভাই ছিল, যিনি ইরফান ও আধ্যাত্মিকতার কারনে জগতে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি ইরানের শহর-বন্দর ও গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে বেড়াতেন আর জনগণকে আখেরাতের বার্তা শোনাতেন। তার নাম ছিল 'আহমাদ' অর্থাৎ আহমাদ গাজ্জালী। বয়সে ইমাম মুহাম্মাদ গাজ্জালীর কয়েক বছর ছোট। মুহাম্মাদ ও আহমাদ উভয়েই সাধনার জগতে অনেক উচ্চ পর্যায়ে পৌছে ছিলেন। মুহাম্মাদ জ্ঞানের জগতে ছিলেন সর্বাগ্রে আর আহমাদ ছিলেন ইরফান ও আধ্যাত্মিকতায় তারও উপরে। ইমাম মুহাম্মাদ গাজ্জালী তার জ্ঞান ও দক্ষতার কারণে তৎকালীন সালজুক্বী রাজবংশের বাদশাহর যোগ্য মন্ত্রী এবং নিজামিয়্যা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠাতা খাজা নিজামুল মুলক তুসীর পক্ষ থেকে ইসলামী বিশ্বের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাগদাদের নিজামিয়ার চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হন। তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে জামায়েতের নামাজ ইক্বামা করতেন। সেই জামায়েতে অংশগ্রহণ করতেন দূর-দূরান্ত থেকে আগত বহু আলেম-দরবেশ, জ্ঞানী-গুনী, আরেফ-অলী এবং ছাত্র-শিক্ষক।]

একবার ইমাম মুহাম্মাদ গাজ্জালী তার সহোদর ভাই আহমাদকে বলেন : "এতসব জ্ঞানী- গুনী ও বিদ্বান ব্যক্তিরা নিকট ও দূর থেকে এখানে আগমন করেন আমার ইমামতিতে এই জামায়েতে শরীক হওয়ার জন্যে। আর তুমি আমার পাশে থেকে এবং ভাই হয়েও এই জামায়েতে অংশগ্রহণ করো না।" উত্তরে আহমাদ তার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাইকে বলেন : "আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে! এখন থেকে আমি আপনার সাথে নামাজে অংশগ্রহণ করবো।"

একদিন মুয়াজ্জিনের আজানের মাধ্যমে জামায়াতের কথা ঘোষনা করা হলো। তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তি ইমাম মুহাম্মাদ গাজ্জালী নামাজে ইমামতির জন্যে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে দন্ডায়মান হলেন। ছোট ভাই আহমাদও অন্যদের সঙ্গে ইমাম মুহাম্মাদ গাজ্জালীর পিছনে জামায়েতে শরীক হলেন। এখনও ইমামের অর্ধেক নামাজ সমাপ্ত হয়নি এমতাবস্থায় আহমাদ তার নামাজ সংক্ষিপ্ত করে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেন। তিনি অনত্র গিয়ে বাকী নামাজ সমাপ্ত করলেন। ইমাম মুহাম্মাদ গাজ্জালী নামাজ শেষে বুঝতে পারলেন তার ভাই জামায়েতের নামাজকে একাকী নামাজে রূপান্তরিত করেছেন। তাই ছোট ভাইকে খোজ করে যখন পেলেন অত্যন্ত রাগান্বিত কন্ঠে জিজ্ঞেস করলেন : "এটা কি কাজ করলে?" আহমাদ : "ভাই মুহাম্মাদ! আপনি কি চান আমি শরিয়তের পথ থেকে দূরে সরে দাড়াই আর আপন দ্বীনি কর্তব্য পালনে ক্রটি করি?" ইমাম মুহাম্মাদ : "না, এটা আমি পছন্দ করি না।" আহমাদ : "আপনি যখন নামাজ আরম্ভ করেছিলেন আমি আপনার পিছনে ইক্বতিদা করেছিলাম আর ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার পিছনে নামাজ অব্যাহত রেখেছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নামাজে ছিলেন।" ইমাম : "আমি কি নামাজের বাইরে চলে গিয়েছিলাম?" আহমাদ : "হ্যাঁ! আপনি নামাজের মধ্যভাগে নামাজ থেকে বাইরে চলে গিয়েছিলেন এবং কাজে ব্যস্ত ছিলেন।" ইমাম : "কিন্ত আমি তো শেষ পর্যন্ত নামাজের মধ্যেই ছিলাম।" আহমাদ : "না ভাই! নামাজের মাঝখানে আপনার ঘোড়ার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আরো স্মরণ হয়েছিল যে, আপনি ঘোড়াকে পানি পান করাতে ভুলে গিয়েছেন। যখন আমি দেখলাম আপনার চিন্তা ও অন্তর আল্লাহর দিক থেকে ঘুরে ঘোড়ার দিকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তখন আমি কর্তব্য মনে করেছি যে, এই নামাজ ত্যাগ করে অনত্র গিয়ে নামাজ আদায়

করি। কেননা তখন আপনি নামাজের মধ্যে ছিলেন না। আর মুসল্লীর এমন কারোর পিছনে ইক্বতেদা করা উচিৎ যিনি নামাজে মধ্যে মশগুল থাকেন।”

ইমাম মুহাম্মাদ গাজ্জালী রাগ দমন করে লজ্জায় মস্তক অবনত করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তার ভাই তার অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত। অতঃপর তিনি তার আশপাশের লোকজনদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : “আমার ভাই আহমাদ সত্য বলেছে। নামাজের মাঝখানে আমার স্মরণ হয়েছিল যে, আমি আমার ঘোড়াকে পানি দিতে ভুলে গিয়েছি।”[১৬]

(১৭)

দুনিয়ার প্রেম বনাম আসমানী প্রেম

[বিশর ইবনে হারিস - যিনি ‘বিশর হাফি’ নামে বিখ্যাত - হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন খ্যাতনাম্য আল্লাহর অলী ছিলেন। তিনি ছিলেন পারস্যের মারভ্ শহরের অধিবাসী যা আজকে তুরকামানিস্থানে অবস্থিত। তবে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় বাগদাদে কাটিয়েছেন। অতঃপর এই বাগদাদেই তিনি সমাহিত হন। কথিত যে তিনি তার জীবনের প্রথম ভাগে পাপ ও আরাম-আয়েশে অতিবাহিত করেছেন। তবে অকস্মাৎ তিনি যোহদ্ ও পারহেজগারীতা এবং অধ্যাত্মিকতায় মনোনিবেশ করেন। তাকে ‘হাফি’ বলা হয় এ জন্যে যে তিনি সর্বদা নগ্নপায়ে ঘুরে বেড়াতেন। তার কাছ থেকে অনেক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত বর্ণনাটি সেগুলোর একটি।]

হযরত বিশর হাফী বলেন : “একবার আমি বাগদাদের বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। ঘটনাক্রমে সেখানে একজন ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করা হচ্ছিল। আমি অবাক হয়ে ঘটনাটি দেখছিলাম। আমি দেখতে পেলাম লোকটি বেত্রাঘাত খাচ্ছিল কিন্তু কোন আর্তনাদ ও ফরিয়াদ করছিল না। চাবুকের আঘাতের পর লোকটিকে কারাগারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আমি উৎসুক চিত্তে ব্যাপারটি জানার জন্যে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম : ‘তুমি কোন আপরাধে চাবুকের

প্রহার ভোগ করলে?' লোকটি বলো : 'প্রেমের বিনিময় এরকমই।' বল্লাম : 'কেন তুমি কোন ক্রন্দন করোনি? যদি ক্রন্দন ও আর্তনাদ করতে তাহলে বেত্রাঘাতের পরিত্রান পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।' লোকটি বলো : 'উপস্থিত জনগণের মাঝে আমার মা'শুক অবস্থান করছিলো। সে আমাকে দেখছিলো আর আমিও তার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করেছিলাম। প্রেমের পথে ক্রন্দন ও আর্তনাদের স্থান নেই।' বললাম : 'যদি তুমি দু'চক্ষু উন্মোচন করে আসমানী মা'শুকের দিকে দৃষ্টি প্রদান করতে তাহলে তোমার অবস্থা কেমন হতো?' আহত লোকটি এ কথাটির অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধি করে আকাশ ফাটা চিৎকার দিয়ে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।[১৭]

(১৮)

হালুয়ার কত মূল্য?

হযরত শিবলী (রহঃ) একদিন ক্লান্ত- পরিশ্রান্ত দেহকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য মসজিদে প্রবেশ করলেন। অযু করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে মসজিদের এক কোণে মসজিদের দেয়ালে হেলান দিলেন তিনি। এত ক্লান্তির মধ্যেও তার চক্ষু বন্ধ হচ্ছিল না। তিনি অবাক হয়ে দেখছেন মসজিদের অভ্যন্তরে সদ্য মুক্ত ছাত্রদের দৌড়া- দৌড়ি। তারা তাদের ক্লাশ শেষ করে টিফিনের সময় কাটাচ্ছে। দুটি শিশু হযরত শিবলী (রহঃ)- র নিকট আসন পেতে বসলো। তারা তাদের আপন আপন খাবারের থলে উন্মুক্ত করলো। এদের একজন পোশাক ও পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি ছিলো। দেখেই স্পষ্ট বুঝা যাবে যে, এটি কোন ধনী পরিবারের সন্তান। ওর থলেতে ছিলো একটি রুটি ও কিছু হালুয়া। আর অন্য শিশুটির থলেতে ছিল শুধু একটি শুকনো রুটি। গরীব ছেলেটি ধনী ছেলেটির থলেতে অসহায় ভাবে তাকালো। গরীব ছেলেটি দেখতে পেলো ধনী ছেলেটি কত মজা করে রুটির সাথে হালুয়া খাচ্ছে। একটি ঢোক গিললো সে। গরীব ছেলেটি অবশেষে লোভ সামলাতে না পেরে বলেই ফেললোঃ "এই ছেলে, আমার শুধু একটি শুকনো রুটি, তুমি কি আমাকে একটু হালুয়া দিতে পারবে?" ধনী ছেলেটি উত্তর দিলো : "না, দিবো

না।’   গরীব ছেলে : “কিন্তু এই শুকনো রুটি যে হালুয়া ছাড়া আমার গলায় প্রবেশ করবে না!” ধনী ছেলে : “যদি এই হালুয়া থেকে একটু তোমাকে দেই তাহলে কি তুমি আমার কুকুর হতে পারবে?” গরীব ছেলে : “জী- হ্যাঁ পারবো।”   ধনী ছেলে : “তাহলে তুমি এখন আমার পোষ্য কুকুর।”   গরীব ছেলে : “হ্যাঁ, ঠিক বলেছো।”   ধনী ছেলে : “তাহলে কেন কুকুরের মতো শব্দ করছো না?” বেচারা গরীব ছেলেটি নিরুপায় হয়ে কুকুরের ডাক দিতে লাগলো আর ধনী ছেলেটি একটু একটু করে হালুয়া দান করতে থাকলো। এভাবে তাদের হালুয়া রুটি খাওয়া শেষ হলো।
হযরত শিবলী (রহঃ) এতক্ষন যাবত ঘটনাটি লক্ষ্য করছিলেন আর কাঁদছিলেন। তার ভক্তবৃন্দরা তাকে মসজিদে পেয়ে তার পাশে বসলেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : “দেখ! লোভ মানুষের জন্যে কি সর্বনাশা পরিণাম ডেকে আনে। যদি এ গরীব শিশুটি ওর নিজের শুকনো রুটিতেই সন্তুষ্ট থাকতো আর অন্যের হালুয়ার প্রতি লোভ না করতো তাহলে কুকুরের ন্যায় অন্যের গোলামী করতে হতো না।”[১৮]

(১৯)

একটি লুঙ্গি ও একটি বালতি

[হযরত আবু সাইদ আবুল খাইর (রহঃ) হিজরী চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দির স্বনামধন্য ও সর্বময় খ্যাত একজন আল্লাহর আরেফ ও সাধক ছিলেন। তিনি হিজরী ৩৫৭ সনে মাইহানাহ নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। দৃশ্যত: সর্বপ্রথম তিনিই ইরফানি চিন্তাধারাকে কাব্যের পোশাক পরিধান করিয়েছেন। তাঁর দৌহিত্র মুহাম্মাদ বিন মুনওয়ার ষষ্ঠ হিজরীতে ‘আসরারুত্ তাওহীদ’ নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থটিতে হযরত আবু সাইদ আবুল খাইর (রহঃ)- এর আধ্যাত্মিক অবস্থান বা মাকমাতের বর্ণনা পাওয়া যায়। তার বর্ণিত ক্ষুদ্র ও ছোট বাক্য এবং সুন্দর সুন্দর ঘটনাবলী সুপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে। নিম্নের ঘটনাটি তাঁর প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।]

একদা আবু মুহাম্মাদ জুভাইনী নামে শেইখের দীর্ঘকালীন ও পুরানো এক বন্ধু ও ছাত্র তাঁর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়িতে আগমন করেন। বাড়ির লোকজন তাকে বল্লেন যে তিনি হাম্মামখানাতে (গণ গোসলখানা) গিয়েছেন। আবু মুহাম্মাদ জুভাইনী কোন কথা না বলেই সোজা হাম্মামের দিকে ছুটলেন। অবশেষে তিনি হাম্মামের ভিতরে তাঁকে খুজে পেলেন। তারা দু'জনে সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ- আলোচনা করলেন।

এক পর্যায়ে শেইখ আবুল খাইর (রহঃ) আবু মুহাম্মাদ জুভাইনীকে বলেন : "তোমার মতে এই হাম্মামখানা কি কোন ভাল ও পছন্দনীয় জায়গা?" উত্তরে আবু মুহাম্মাদ বললেন : "জি, হ্যাঁ।" শেইখ আবারো প্রশ্ন করেন : "কেন?" আবু মুহাম্মাদ বলেন : "কারণ জনাব শেইখ এখানে আছেন। আর যেখানেই আমাদের শেইখ, আবুল খাইর আছেন সেখানটাই একটি ভাল জায়গা।" "এর চেয়ে কোন ভাল যুক্তি আনো।" শেইখ বল্লেন। আবু মুহাম্মাদ হযরতের কাছে অনুরোধ করলেন যে, তিনি যেন এই হাম্মামখানার জায়গাটা কেন ভাল ও পছন্দনীয় তার কারণ বলে দেন। শেইখ বললেন : "হ্যাঁ, এটা ভালো জায়গা, কেননা এখানে তোমার সাথে একটি লুঙ্গি ও একটি বাল্তি ছাড়া আর কিছু নেই, আর এ দু'টোও আমানত স্বরূপ নেয়া হয়েছে।"[১৯]

(২০)

হাক্বিক্বাতের মূল্য

হযরত আলামা শিবলী (রহঃ) হযরত যুনাঈদ বাগদাদী- র (রহঃ) কাছে গিয়ে বলেন : "মানুষ বলে, হাক্বিক্বাতের রত্ন আপনার কাছে আছে। ওটাকে হয় আপনি আমার কাছে বিক্রি করুন নতুবা আমাকে দান করে দিন।"

হযরত যুনাঈদ (রহঃ) উত্তরে বলেন : "যদি তোমার কাছে বিক্রি করতে চাই তাহলে তুমি তার মূল্য পরিশোধ করতে পারবে না। আর যদি ওটাকে দান করতে চাই তাহলে তুমি তার মূল্য বুঝতে

পারবে না। কেননা যে তাকে স্বল্প মূল্যে খরিদ করে সে সস্তায় হাতছাড়া করে, আর দেখ না শিশুরা মূল্যবান রত্ন এক টুকরো রুটির বদলে দিয়ে দেয়।”

হযরত শিবলী (রহঃ) বলেন : “তাহলে আমার কর্তব্য কী?” “ধৈর্য ও প্রতিক্ষার মাকামে অবস্থান গ্রহণ কর আর এই ব্যথায় জ্বলে নিজেকে তৈরী করো যেন তা অর্জনের যোগ্যতা লাভ করতে পারো। কেননা, এরকম মহামূল্যবান রত্ন যোগ্য ও সত্যবাদী প্রতীক্ষমাণ ও অন্তরক্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যতীত অন্যদের দেয়া হয় না।” বললেন হযরত যুনাঈদ বাগদাদী (রহঃ)।[২০]

(২১)

বৃদ্ধ বাদক

তিনি মিম্বার থেকে নেমে আসলেন আর জনতা ধীরে ধীরে সভা ত্যাগ করছিলো। শেইখ আবু সাইদ আবুল খাইর আজ রাতে কি উদ্দীপনা সৃষ্টি করলেন? উপস্থিত জনতা সকলে তাঁর বক্তব্যের মুগ্ধতায় নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিল। তিনি তাঁর প্রতিটি বাক্য উচ্চারণে জনতার অন্তরে উদ্দীপনার চারাগাছ বপন করে যাচ্ছিলেন।

আর আমি তখনো আমার ঋণ পরিশোধের চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। ঋণের বোঝা আমাকে ধুকে ধুকে খাচ্ছিল। কি করবো, কিভাবে আমার ঋণ পরিশোধ করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তিনি নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবেন। শেইখ এক কোনে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর মানুষ তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। অকস্মাৎ একজন বৃদ্ধা সামনে এগিয়ে আসলো। শেইখ আমাকে ইশারা করলেন। আমি বুঝতে পারলাম আমাকে বৃদ্ধার কাছে যেয়ে তার হাজত ও অভিপ্রায় জেনে নিতে হবে। বৃদ্ধা বললেন : “একশত দিনারের একটি স্বর্ণমূদ্রার থলে নিয়ে এসেছি শেইখকে দেয়ার জন্যে যেন তিনি তা অভাবী লোকদের মাঝে বিতরণ করতে পারেন। তাকে বলবেন আমার জন্যে দোয়া করতে।” আমি তার কাছ থেকে স্বর্ণমূদ্রার থলেটি নিয়ে শেইখের হাতে তুলে দিলাম। আমি মনে মনে ভাবলাম শেইখ নিশ্চয়ই আমার অভাবের কথা জানতে পেরেছেন এবং এই থলেটি আমাকে

দান করবেন। কিন্তু শেইখ আবু সাইদ আবুল খাইর (রহঃ) বল্লেন : “এ থলেটি শহরের গোরস্থানে নিয়ে যাও। সেখানে একজন বৃদ্ধ পড়ে আছে। আমাদের সালাম তার কাছে পৌছিয়ে এ স্বর্ণমূদ্রার থলেটা তাকে দিয়ে দেবে। আর বলবে -যদি তুমি চাও আমাদের কাছে আসতে পারো, তোমাকে আরো অর্থ দান করবো।”

সেই রাতেই কবরস্থানে পৌছে গেলাম। পথিমধ্যে নিজে নিজে ভাবছিলাম যে, এ লোকটি কে, যার অবস্থার কথা হযরত শেইখ জানেন। আর আমার প্রয়োজনের কথা জানেন না এবং তা মেটানোর কোন প্রচেষ্টাও করেন না। যখন শেইখের দেয়া ঠিকানা মত কবরস্থানের সেই স্থানে পৌছালাম দেখতে পেলাম একজন বৃদ্ধলোক বাদ্যযন্ত্র মাথার নিচে রেখে ঘুমিয়ে আছে। তাকে আমি সালাম দিলাম আর শেইখের সালামও তার কাছে পৌছালাম। তবে সে আমাকে দেখে প্রচন্ডভাবে ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে পড়েছিল। ভয় তাকে অক্টোপাশের মতো ঘিরে ধরলো। তিনি চাচ্ছিলেন আমার পরিচয় জানতে। কিন্তু তার আগেই আমি স্বর্ণমূদ্রার থলেটা তার হাতে রাখলাম। অতঃপর শেইখের পয়গাম তার কাছে পৌছালাম। বৃদ্ধ তখনো হতবাক ও ভীতসন্ত্রস্থ অবস্থায় কাটাচ্ছিল। সে থলেটি খুলে বিস্ময়ের সাথে স্বর্ণমূদ্রা দেখে নিলো। প্রথমতঃ বিশ্বাসই করতে পারছিলো না। মনে করছিলো সে কোন স্বপ্ন দেখছে। তবে যখন স্বর্ণমূদ্রা হাতে ধরে সত্যি বলে অনুভব করলো, তখন তার বিস্ময় কেটে গেলো। সে বুঝতে পারলো এটা কোন স্বপ্ন নয় বরং বিশ্বাসযোগ্য বাস্তাবতা। সেই বৃদ্ধ লোকটি এবার আস্তে আস্তে মাথা উচু করে আমার দিকে তাকালো। অতঃপর বললো : “আমাকে তোমার শেইখের কাছে নিয়ে চলো।”

বল্লাম : “চল! তোমাকে নিয়ে যাই।” যাত্রা পথেও বিস্মিত ও মানসিকভাবে অস্থির ছিল বৃদ্ধ লোকটি। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম : “আমি যদি তোমার কাছে একটি প্রশ্ন করি তুমি কি তার উত্তর দেবে?” বৃদ্ধ লোকটি মাথা নিচু করে সম্মতি দিলো। আমি বলাম : “তোমার পরিচয় কি? গোরস্থানে তুমি কি করছিলে? আর হযরত শেইখ এই স্বর্ণমূদ্রার থলেটা কেন তোমাকে দিলেন?” বৃদ্ধ হাই তুলে খুব দুঃখের সাথে বলল : “আমি একজন দুঃস্থ ফকির মানুষ এবং সকলের কাছ থেকে বিতাড়িত। আমার পেশা বাদ্য- যন্ত্র বাজানো। যখন আমি যুবক ছিলাম তখন লোকজন

আমাকে তাদের সভা-সমাবেশে গান ও বাদ্য-বাজনা দিয়ে আনন্দ দেয়ার জন্যে ডাকতো। শহরের সব জায়গায় ছিলো আমার ভীষণ কদর। আর এখন আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। আমার কন্ঠস্বর কাঁপে আর আগের মত হাত দিয়ে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারি না। পূর্বের ন্যায় গলার আওয়াজও আর নেই। তাই কেউ আমাকে তাদের সভায় ডাকে না। কেননা আমি তো এখন একজন নিরস ও অপারগ ব্যক্তি। আমার স্ত্রী ও পরিবারের লোকেরাও আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে আজ রাতে শহরের অলি-গলিতে নিঃসঙ্গ পদচারণা করছিলাম। আজকে রাত্রি যাপনের জন্যে একটা জায়গা খুজছিলাম। অবশেষে নিরুপায় হয়ে এই গোরস্থানে আশ্রয় নিলাম এবং ব্যথিত ও বেদনা ভরপুর মনে কিছুক্ষন আল্লাহর কাছে মোনাজাত করলাম।

বল্লাম : 'হে আমার প্রতিপালক! আমার যৌবন, সহায়-সম্বল সব কিছু চলে গেছে। কোথাও একটুখানি জায়গাও নেই। আমাকে কেউ গ্রহণও করে না। এতকাল মানুষের জন্যে গান গেয়েছি, বাদ্য বাজিয়েছি এবং তাদের আসরগুলো জমিয়ে তুলেছি আর অবশেষে আজকে আমার এই পরিণতি। আজ রাতে আমি তোমাকে গান ও বাদ্য- বাজনা শোনাবো। অনেক রাত পর্যন্ত বাদ্যসহ গান গেলাম আর সে সভায় শুধু আমি এবং আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ছিলো না। বাদ্য বাজিয়ে এবং গান গেয়ে গরম করে তুলেছিলাম। গান গাচ্ছিলাম আর ক্রন্দন করছিলাম। এমনি করে ঘুমিয়ে পড়লাম।"

এতক্ষনে শেইখের গৃহের কাছাকাছি এসে পড়েছি। বৃদ্ধ চিন্তামগ্ন ছিল এবং কিছই বুঝে উঠতে পারলো না কি হয়েছে। শেইখের গৃহে প্রবেশ করলাম। তিনি ঘরের এক কোনে বসে ছিলেন। বৃদ্ধ বাদক তৎক্ষনাত হযরতের পায়ে আছাড় খেয়ে পড়লো এবং পূর্বের কৃত-কর্মের কারণে তাঁর কাছে তাওবা করলো।

শেইখ আবু সাইদ আবুল খাইর (রহঃ) বল্লেন : "হে সাহসী! এক রাত আল্লাহর জন্যে বাদ্য বাজালে ও গান গেলে, আল্লাহ তোমার কষ্ট ও শ্রমকে নষ্ট করেননি এবং তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দিলেন তোমার খোজ- খবর নিতে এবং তোমাকে আশ্রয় দিতে।"

একদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। হযরত শেইখ সবে মাত্র মজলিস ও মিম্বার থেকে নিচে নেমে আসছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি দু'শত দিনার আমার হাতে দিয়ে বললেন : "এই দিনারগুলো নিয়ে হযরত আবু সাইদ আবুল খাইর সাহেবকে দিয়ে এসো।" যখন আমি হযরতের খেদমতে পৌছলাম তিনি আমাকে বললেন : "এগুলো নিয়ে তোমার পাওনাদারদের বুঝিয়ে দাও।"[২১]

(২২)

এমন হয়ো না

খাজা আব্দুল করিম ছিলেন হযরত শেইখ আবু সাইদ আবুল খাইর (রহঃ)- এর একজন বিশেষ খাদেম। তিনি বলেছেনঃ "একদিন জনৈক ব্যক্তি আমার কাছে শেইখের জীবনের কিছু ঘটনা লিখে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করলো। আমি তার অনুরোধ রক্ষার জন্যে লেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এমন সময় কেউ এসে আমাকে বল্লো : "শেইখ তোমাকে ডাকছেন" । শেইখের খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : "কি করছিলে?" উত্তরে বললাম : "একজন দরবেশ আমাকে আপনার জীবনের কিছু ঘটনা লিখে দেয়ার অনুরোধ করলে আমি তা লেখার জন্যে মনোনিবেশ করেছিলাম।" একথা শুনে শেইখ বলেন : "হে আব্দুল করিম! কাহিনী লেখক হয়ো না, বরং এমন হও যেন তোমার জীবন থেকে অন্যেরা কাহিনী বর্ণনা করতে পারে।"[২২]

(২৩)

আল্লাহর গোপন রহস্য

একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত শেইখ আবুল খাইর (রহঃ)- এর নিকট এসে বলো : "এই শেইখ! আমি আপনার কাছে হাক্ব তায়ালার গোপন রহস্য শিক্ষা নেয়ার জন্যে এসেছি।" লোকটির কথা শুনে শেইখ বললেন : "ফিরে যাও, আগামীকাল এসো।" লোকটি ফিরে গেল। শেইখ সেদিনই

নির্দেশ দিলেন একটি ইদুর ধরে বাক্সে ভরে তার মুখটা শক্ত করে বেঁধে রাখতে। পরের দিন ঐ লোকটি এসে উপস্থিত। “হে শেইখ! গতকাল যা আপনি ওয়াদা করেছিলেন তা আজকে পুরণ করুন” লোকটি বলল।

শেইখ নির্দেশ দিলেন ঐ বাক্সটি যেন লোকটিকে দেয়া হয়। অতঃপর তিনি বল্লেন : “এই বাক্সের দরজা খুলবে না কিন্তু।” লোকটি বাক্সটি নিয়ে বাড়ীর দিকে চলে গেল। বাড়ীতে গিয়ে অধৈর্য হয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করলোঃ “আচ্ছা! এই বাক্সের ভিতর আল্লাহর কি গোপন রহস্য লুকায়িত আছে?” যতই চেষ্টা করলো লোকটি তার কৌতূহল সামলাতে পারলো না। অবশেষে সে বাক্সটির দরজা খুলে ফেললো। একটি ইদুর ভিতর থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলো। লোকটি শেইখের কাছে এসে রাগ করে বললো : “এই শেইখ! আমি আপনার কাছে আল্লাহর কোন গোপন রহস্য চেয়েছিলাম। আর আপনি আমাকে একটি ইদুর উপহার দিলেন?” শেইখ বল্লেন : “হে দরবেশ! আমরা একটি ইদুর বাক্সের ভিতর ভরে দিয়েছিলাম তা তুমি গোপন করতে পারলে না! আর আল্লাহর গোপন রহস্যের ভেদ তোমার কাছে কিভাবে বলবো?”[২৩]

(২৪)

উপযুক্ত ব্যক্তি

একবার কেউ হযরত আবু সাইদ আবুল খাইর (রহঃ)- কে বলল : “আমরা এমন এক ব্যক্তিকে চিনি যার আধ্যাত্মিক মাক্বাম এমন পর্যায়ে যে তিনি পানির উপর দিয়ে পদচারণা করতে পারেন।” শেইখ শুনে বললেন : “এটা কোন কঠিন কাজ হলো নাকি? আল্লাহর এ পৃথিবীতে এমন কতো পাখি আছে যারা পানির উপর দিয়ে খুব সহজে হাটা- চলা করতে পারে।”

ঐ ব্যক্তি বলল : “তিনি বাতাসে উড়ে বেড়ান।” শেইখ বললেন : “মাছিও তো বাতাসে উড়ে।” ঐ ব্যক্তি বলো : “আবার এমন কেউ আছেন যিনি এক মুহূর্তে এক শহর থেকে অন্য শহরে চলে যেতে পারেন।”

এবার শেইখ আবুল খাইর (রহঃ) ভাবগম্ভীর হয়ে বললেন : "শয়তানও তো এক নিমিষে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে চলে যেতে পারে। এগুলো কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। সাহসী ও উপযুক্ত সাধক ঐ ব্যক্তি যিনি মানুষের মাঝে জীবন-যাপন করেন, উঠা-বসা করেন এবং তাদের সাথে চলা-ফেরা ও মেলা-মেশা করেন কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহকে ভুলেন না।"[২৪]

(২৫)

এক কদম সামনে

শেইখ আবু সাইদ আবুল খাইর (রহঃ) একবার তুস শহরে আসলেন। জনগণ তাঁকে ঘিরে ধরলো আর তাঁকে কিছু বক্তব্য রাখার জন্যে অনুরোধ করলো। শেইখ তাদের অনুরোধে সম্মতি প্রকাশ করলেন। জনতা আনন্দ-উল্লাসের সাথে শেইখের জন্যে অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ বক্তৃতার আসন প্রস্তত করলো। খবর শুনে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসা শুরু করলো। অল্প কিছুক্ষনের মধ্যেই সমাবেশ স্থলে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। হযরত শেইখ (রহঃ) তাঁর আসন অলংকৃত করলে কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সভা আরম্ভ করা হলো। জনগণ তখনো সমাবেশের দিকে ছুটছে। কিন্তু আর যে কিছুতেই লোকদের জায়গা দেয়া যাচ্ছে না। তিল পরিমান ঠাই নেই। তবুও জনতা সমাবেশ স্থলের দিকে ঠেলে আসছে। এদিকে শেইখ (রহঃ) তাঁর আসনে উপবিষ্ট হয়ে বক্তৃতার জন্যে প্রস্তত হয়েছেন। হঠাৎ একজন দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে চিৎকার করে বলল : "আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন যিনি তার নিজের অবস্থান থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এক কদম সামনে এগিয়ে আসেন।"

হযরত আবু সাইদ আবুল খাইর (রহঃ) লোকটির কথা শেষ হলে বল্লেন : "ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি আজমায়িন (আল্লাহর দুরুদ ও সালাম মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের সকলের উপর বর্ষিত হোক)।" একথা বলেই তিনি আসন থেকে নেমে গেলেন। লোকজন তাঁকে

বলতে লাগলো : “ইয়া শেইখ! আপনার বক্তব্য শোনার জন্যে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন জমায়েত হয়েছে আর আপনি আসন ত্যাগ করছেন ?! ” শেইখ বল্লেন : “আমি যা কিছু বলতে চেয়েছিলাম আর আল্লাহর নবী-রসুলেরা যা বলেছেন তার সবটুকু ঐ ব্যক্তি উচ্চস্বরে বলে দিয়েছেন।

সকল আসমানী কিতাব ও নবী-অলীদের ওয়াজ-নসিহতে এটা ব্যতীত আর কি ছিলো যে তারা বলতে চেয়েছেন, ‘হে জনগণ! তোমরা এক কদম সামনে এগিয়ে এসো’।” সেদিন শেইখ এর বেশী আর কিছু বলেন নি।[২৫]

(২৬)

মানুষের বর্জ্যের অভিযোগ

হযরত শেইখ আবু সাঈদ আবুল খাইর (রহঃ) তাঁর মুরিদদের সাথে কোন এক স্থান অতিক্রম করছিলেন। সেখানে কোন এক বাড়ীর শৌচাগারের কুয়ো পরিস্কার করা হচ্ছিল। কুয়ো পরিস্কারকারী শ্রমিকরা ময়লাগুলো কুয়ো থেকে তুলে এক পার্শ্বে স্তুপ করে রাখছিল। শেইখের ছাত্ররা কাপড় গুটিয়ে খুব সাবধানে দ্রুত গতিতে সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলেন। হযরত তাদেরকে ডেকে বল্লেন : “তোমরা দাড়াও! তোমাদেরকে বলে দিই, এই বর্জ্য বস্তুগুলো তাদের ভাষায় আমাদেরকে কি বলছে।

তারা বলছে, ‘আমরা গতকালের সেই সুস্বাদু ও সুঘ্রান খাদ্যসামগ্রী যেগুলোকে আপনারা চড়া দামে কিনেছিলেন আর ওগুলো পাওয়ার জন্যে আপনারা নিজেদের প্রাণ ও অর্থ দিতে এবং যে কোন কষ্ট স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। আমরা তো সুঘ্রান ও সুস্বাদু খাবার ছিলাম। যেই না এক রাত্র আপনাদের সাথী হলাম আপনাদের রং ও গন্ধ আমাদের গায়ে মেখে নিলাম। এখন আপনারা আমাদের কাছ থেকে পালাচ্ছেন? আমাদেরই উচিৎ আপনাদের কাছ থেকে পালানো।”[২৬]

(২৭)

চোরের পুরস্কার

এক রাত্রিতে চোর হযরত আহমাদ খাজরাবীর (রহঃ) গৃহে প্রবেশ করলো। অনেক খোজা- খুজির পরও চুরি করার মত কোন জিনিষ চোরের দৃষ্টিগোচর হলো না। তাই নিরাশ হয়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। এমন সময় সহসা হযরত আহমাদ খাজরাবী চোরকে ডেকে বলেন : "এই যুবক! এই বালতিটা নিয়ে কুয়ো থেকে পানি তুলে অযু করে আস আর নামাজে দাড়িয়ে যাও। আর এই সময় যদি কিছু এসে যায় তোমাকে দিয়ে দিবো। তুমি এই বাড়ি থেকে খালি হাতে ফিরে যাবে এটা মোটেও ঠিক নয়।"

যুবক চোর কুয়ো থেকে পানি তুলে অযু করে নামাজ আদায় করলো। রাত গড়িয়ে দিনের আলো উদ্ভাসিত হলো। জনৈক ব্যক্তি হযরত আহমাদের ঘরের কড়া নাড়লো। সে ভিতরে এসে এক শত পঞ্চাশ দিনার হযরত শেইখের হাতে তুলে দিয়ে বলো : "এগুলো হযরত শেইখের জন্যে হাদীয়া।" হযরত শেইখ আহমাদ চোরের দিকে তাকিয়ে বললেন : "দিনারগুলো নিয়ে চলে যাও। এটা এক রাত্র নামাজের পুরস্কার।" চোরের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। তার দেহে কম্পন শুরু হলো। কাঁদতে কাঁদতে শেইখকে বলো : "এ পর্যন্ত আমি অন্যায় পথে চলেছি। একটি রাত আল্লাহর ধ্যানে কাটালাম এবং নামাজ আদায় করলাম। আল্লাহ আমাকে এরকম সম্মানিত ও অভাব পূরণ করলেন। হে শেইখ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আপনার কাছে রেখে আমাকে সত্য পথের শিক্ষা দিন।" চোর স্বর্ণমূদ্রার থলেটি শেইখের কাছে ফেরত দিয়ে তার একনিষ্ঠ মুরিদদের মধ্যে গণ্য হয়ে গেল।[২৭]

(২৮)

কঠিন আযাব

কথিত আছে যে, বনি ইসরাইল গোত্রের এক ব্যক্তি গর্বের সাথে বলতোঃ "আমি সারা জীবন আল্লাহর নাফরমানী করলাম এবং এমন কোন পাপ নেই যা আমি করিনি। কিন্তু এর বদলে আমার কোন ক্ষতিও হয়নি আর কোন শাস্তিও পাইনি। যদি গুনাহর পরিণতিতে শাস্তি নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে কেন আমার উপর শাস্তি নাযিল হয় না?"

সে আমলে বনি ইসরাইলের নবী ঐ লোকের কাছে এসে বল্লেন : "আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তিনি তোমাকে অনেক আযাব দিয়েছেন কিন্তু তুমি তা জান না! আল্লাহ বলেছেন, আচ্ছা আমি কি তোমাকে আমার ইবাদতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করি নি? আমি কি মুনাজাতের দুয়ার তোমার জন্যে বন্ধ করে দিইনি? আমি কি আখেরাতের বেহেস্তের আনন্দময় জীবনের ব্যাপারে তোমাকে নিরাশ করিনি? এর চেয়ে বড় এবং ভয়ংকর আযাব তুমি কি চাও?"[২৮]

(২৯)

ইরফানী দোয়া

[হযরত মা'রুফ ইবনে ফিরুয কারখী ছিলেন মা'রুফ কারখী নামে বহুল পরিচিত। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় হিজরী শতকের শেষাংশে সবচে আলোচিত ব্যক্তি এবং বিখ্যাত যাহেদ ও সুফি-দরবেশদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর জন্ম বাগদাদ নগরীর কারখ এলাকায়। তিনি আহলে বাইতের অষ্টম ইমাম হযরত ইমাম রিযা (আঃ)- এর হাতে তাওবা করেন এবং ইরফানের উচ্চ মাক্বামে অধিষ্টিত হন। তিনি পরোপকারিতা ও মানব সেবায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। অবশেষে তিনি দু'শত হিজরীতে পরলোকগমন করেন।]

বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি তার কয়েকজন ভক্তের সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি একদল ফাসেদ ও দুঃশ্চরিত্র যুবককে দেখতে পেলেন। তিনি যখন দজলা নদীর তীরে

পৌছুলেন তখন তাঁর সাথীরা বলল : “ইয়া শেইখ, আপনি আল্লাহর কাছে অসামাজিক কার্যকলাপে ভেসে যাওয়া এই যুবকদেরকে এই নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দোয়া করুন। এর ফলে ওদের অত্যাচার থেকে শহরবাসীরা রেহাই পাবে।”

মা'রুফ কারখী তাদেরকে বললেন : “তোমরা হাত উচু কর। আমি দোয়া করবো আর তোমরা আমিন বলবে।” শেইখের সাথীরা হাত তুললো এই অসৎ চরিত্রসম্পন্ন যুবকদের ধ্বংসের জন্যে এবং শেইখের দোয়াতে আমিন বলতে। শেইখ বল্লেন : “হে পারওয়ারদেগার! যেমনি করে এই যুবকদের এ জগতে আনন্দ- উল্লাসে মত্ত রেখেছো, তেমনি করে পরজগতেও তাদেরকে আনন্দ উল্লাসের অংশীদারী করো।” শেইখের সাথীরা আচমকা বিস্ময়াভূত হয়ে গেলো। তারা অবাক কন্ঠে তাদের পীর সাহেবকে প্রশ্ন করলেন : “হে পীর! এটা কেমন দোয়া আপনি করলেন। আমরা এর রহস্য তো বুঝতে পারলাম না।” ঘটনাক্রমে এ পথ দিয়ে অতিক্রম করছিলো সে যুবকরা। কিছুক্ষন পর যখন যুবকরা সাধকের সাক্ষাৎ লাভ করলো তখন তাদের মধ্যে ভাবান্তরের উদ্রেক হলো। তারা সকলে মদের পাত্রগুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। আর শেইখের হাত- পা জড়িয়ে ধরে মাফ চাইতে লাগলো। শেইখ তাঁর সাথীদের বল্লেন : “তাদের ব্যাপারে আমার দোয়া কবুল হয়েছে। তারা যদি এই তাওবার হালতে মারা যায় তাহলে পরকালের আনন্দ- উল্লাসও উপভোগ করবে। এটা কি তোমাদের অনুরোধের প্রার্থনার চেয়ে উত্তম হল না?”[২৯]

(৩০)

তিরস্কারের ফল

[সেররি সাক্তি ছিলেন বাগদাদ শহরের বিখ্যাত আরেফ ও সুফি। তিনি এ পৃথিবীতে আটানব্বই বৎসর জীবিত ছিলেন এবং হিজরী দু'শত একান্ন সনে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর তরিকায় মহব্বত ও উদ্দিপনা দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগনিত। জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)

যিনি ইসলামী খ্যাতনামা আরেফ ও তাঁর ভাগ্নে ছিলেন, তিনি অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে তাকে যেন হযরত সেররি সাক্তি (রহঃ) কবরের পার্শ্বে সমাহিত করা হয়।]

বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার হযরত ইয়াকুবকে (আঃ) স্বপ্নে দেখেছিলেন। স্বপ্নে তিনি আল্লাহর নবীকে বলেন : "হে আল্লাহর নবী! আপনার পুত্র ইউসুফের জন্যে এরকম উদ্বেল ও আবেগের ঝড় এ দুনিয়াতে তুলেছেন? আল্লাহর প্রতি তো আপনার পরিপূর্ণ মহব্বত আছে। ইউসুফের কথা আপনার স্মরণ থেকে মুছে ফেলেন।"

এ ঘটনার কিছুদিন পর হযরত সেররি তার অন্তরের গভীরে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। সে আওয়াজ তাকে বলছে, 'আচ্ছা দেখে নাও!'। আধ্যাত্মিক জগত থেকে তাকে হযরত ইউসুফের সৌন্দর্য ও রূপবান চেহারা দেখানো হলো। তিনি ভয়ানক চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে গেলেন। এভাবে তের দিন জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে রইলেন তিনি। যখন তার জ্ঞান ফিরে এলো তখন তাকে বলা হলোঃ "এটা হলো প্রেমিকদের তিরস্কারের ফল।"[৩০]

(৩১)

অনুপযুক্ত শোকর

আল্লাহর এক অলী বলেন : "আমি একটিবার শুধু আল্ হামদুলিল্লাহ্ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে) বলার জন্যে ত্রিশ বৎসর যাবৎ ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে যাচ্ছি। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : "একদিন আমার কাছে সংবাদ দেয়া হলো যে বাগদাদের বাজারে অগ্নি- সংযোগের কারণে সব দোকন- পাট পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। কিন্তু আমার দোকানের কিছুই হয়নি। আমি তখন বলে উঠলাম, 'আল্ হামদুলিল্লাহ'। পরক্ষনেই আত্মসম্বিত ফিরে পেলাম। নিজের কাছে নিজেকে খুব লজ্জিত মনে হচ্ছিল। আমি নিজেকে মুসলমান ভাইদের চেয়ে উত্তম মনে করলাম আর তাদের বিয়োগ- বেদনাকে আমি তোয়াক্কা করলাম না!? এর অর্থ হচ্ছে

অন্যান্য মুসলমান ভাইদের ব্যাপারে আমি কোন দায়িত্ব অনুভব করিনি। সুতরাং এই অনুপযোগী আল্ হামদুলিল্লাহর কারণে ত্রিশ বৎসর ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"[৩১]

(৩২)

ভাইয়ের আশা

[আবু যাকারিয়া ইয়াহিহয়া ইবেন মুয়াজ ছিলেন বালখ নগরীর একজন বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ওয়ায়েজ ও দুনিয়াবিমুখ যাহেদ। তিনি নিশাপুর এলাকায় হিজরী দু'শত আটান্ন সনে ইন্তেকাল করেন। তার তরিকার চর্চা ভয় ও আতংকের চেয়ে বেশী ছিল প্রত্যাশার উপর। তিনি অত্যন্ত সুমধুর ও প্রভাবপূর্ণ কন্ঠে ওয়াজ করতেন। তার ওয়াজের কারণে অনেক মানুষ সত্যপথ গ্রহণ করেছিল। তাই অনেকে বলেন : "আল্লাহর দু'জন ইয়াহিহয়া ছিলেন, একজন নবীদের মধ্য থেকে অন্যজন অলীদের মধ্য থেকে।"]

একবার হযরত ইয়াহিহয়ার (রহঃ) কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইবাদত- বন্দেগী ও ইতেক্বাফের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা নগরীতে গমন করেছিলেন। তিনি মক্কা থেকে তার বড় ভাই ইয়াহিহয়াকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটি নিম্নরূপ : "ভাইজান, আসসালামু আলাইকুম। আমার জীবনে তিনটি আরজু বা আকাঙ্খা ছিল যার দু'টি পূরণ হয়েছে আর একটি অবশিষ্ট রয়ে গেছে। সে তিনটি কামনা হচ্ছে : এক : আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম তিনি যেন আমার মৃত্যু কোন এক পবিত্র ভুমিতে নির্ধারন করেন। আর আমি এখন পবিত্র নগরী মক্কাতে অবস্থান করছি। মৃত্যু অবধি আমি এখানেই কাটাবো। দুই : আল্লাহর কাছে আমি সর্বদা এমন একজন উপযুক্ত ক্রীতদাসী কামনা করেছিলাম যে আমার ইবাদতের সরঞ্জাম যোগাড় করে দিতে পারে এবং এ পথে আমাকে সেবা দিতে পারে। এখন আমি ঐ রকম একজন দাসী পেয়েছি। সে আমাকে এ পথে প্রচুর সহযোগীতা করে এবং আমার খেদমতে ত্রুটি করে না। তৃতীয় কামনাটি হচ্ছে এই যে, মুত্যুর পূর্বে যেন আপনার সাক্ষাত পাই। আমি আশা করছি আমার এই আকাঙ্খাও পূরণ হবে। ওয়াস্ সালাম।"

হযরত ইয়াহিহয়া (রহঃ) তাঁর ভাইয়ের পত্রের উত্তরে লিখেন : "তুমি লিখেছিলে তোমার কামনা হচ্ছে তুমি যেন পবিত্র জায়গায় অবস্থান করতে পার এবং সেখানেই হক্কের দাওয়াতে লাব্বাইক (জি হাজির) বলতে পার। তাই আমি বলছি, তুমি আল্লাহর সর্বোত্তম বান্দা হও, যেখানে ইচ্ছা অবস্থান গ্রহণ কর, যেখানে ইচ্ছা সেখানেই মৃত্যুকে স্বাগতম জানাও। মানুষের কারণে স্থান পবিত্র ও সম্মানিত হয়ে থাকে, স্থানের কারণে মানুষ পবিত্র ও সম্মানিত হয় না। আর তুমি লিখেছ তোমার পূর্বের ইচ্ছার মত একজন খাদেমা পেয়েছো। যদি তোমার সৎ সাহস থাকতো তাহলে হাক্বতায়ালার খাদেমকে নিজের খাদেম হিসেবে মেনে নিতে পারতে না এবং তাকে হাক্বতায়ালার খেদমত থেকে বঞ্চিত করতে না। সৎ সাহসী ও মহৎ ব্যক্তিরা খাদেম হওয়ার আকাঙ্খা করে থাকেন, অন্যের খেদমত বা সেবার আশা করেন না। বান্দার কাজ হলো বন্দেগী করা, কর্তৃত্ব করা নয়। আর তোমার তৃতীয় ইচ্ছা ছিলো আমাকে দেখার। যদি তোমার অন্তরে আল্লাহর পাক ইরফানের কোন খবর থাকতো তাহলে আর আমার স্মরণ করতে না। যেখানে তুমি আছো সেটা হলো হযরত ইব্রাহিম (আঃ)- এর মাকাম বা স্থান। অর্থাৎ সেটা এমন এক জায়গা যেখানে পিতা পুত্রকে কতলগাহ্ জবেহ্ করার জন্যে নিয়ে যায় আর তুমি সেখানে ভাইয়ের সাক্ষাৎ কামনা করছো? যদি সেই পবিত্র স্থানে আল্লাহর সান্নিধ্য পেয়ে যাও তাহলে সেখানে আমি কি কাজে আসবো? আর যদি আল্লাহর সাক্ষাত না পাও তাহলে আমার কাছ থেকে তুমি কি লাভ পেতে পারো?"[৩২]

(৩৩)

আলেমের পদস্খলন

[হযরত আবু হানিফা ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়েতের একজন বিশিষ্ট ও খ্যাতনামা আলেম। সুন্নি ফেকাহগত চার মাযহাবের একটির ইমাম তিনি এবং তার নাম অনুসারে সেই মাযহাবের নামকরণ করা হয়েছে। তিনি আশি হিজরীতে পৃথিবীতে আগমন করেন এবং সত্তর

বৎসর পর অর্থাৎ এক শত পঞ্চাশ হিজরীতে আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুরের নির্দেশে কারারুদ্ধ অবস্থায় পরলোকগমন করেন।]

বর্ণিত যে, একদা হযরত আবু হানিফা (রহঃ) কোন এক জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি একটি শিশুকে দেখে থমকে দাড়ান। শিশুটি কাঁদামাটির মধ্যে পা ঢুকিয়ে দাড়িয়ে আছে। তাই তিনি শিশুটিকে বলেন : "সাবধান থেকো! কাঁদার মধ্যে পড়ে যেও না।"

শিশুটি উত্তরে বলে : "আমার পড়ে যাওয়া কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না। কেননা আমি যদি পড়ে যাই তাহলে শুধুমাত্র নিজেকেই কর্দমাক্ত ও ময়লা করে ফেলবো। হ্যাঁ, আপনি নিজেকে রক্ষা করুণ। আপনার যদি পদস্খলন ঘটে তাহলে মুসলমানরা সত্য পথ থেকে বিচ্যুতি হয়ে যাবে আর এর গুনাহর ভাগী আপনিই হবেন।"

হযরত আবু হানিফা শিশুটির মুখে এরকম চমকপ্রদ উপদেশমূলক কথা শুনে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।[৩৩]

(৩৪)

মৃত্যুর প্রস্তুতি

কথিত যে, একদা জনৈক আল্লাহর অলী ও সাধক সালাত আদায়ের জন্যে এক অচেনা মসজিদে গমন করেন। তারপরও মসজিদের মুসল্লিরা তাঁকে চিনে ফেলে। তারা সকলে করজোড় করে তাঁর কাছে অনুরোধ জানালো সালাতান্তে মেম্বারে উঠে মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক কিছু বক্তব্য রাখার জন্যে। তিনি সম্মত হলেন। জামায়াত সমাপ্ত হয়েছে। সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে কেন্দ্রীভূত। আধ্যাত্মিক সাধক উঠে দাড়ালেন। তিনি মেম্বারের প্রথম সিঁড়িতে বসলেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পাঠ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এবং তাঁর পবিত্র আহলে বাইত- এর প্রশংসা ও গুণগান গাইলেন। অতঃপর উপস্থিত নামাজিদের উদ্দেশ্যে বলেন : "হে ভাইয়েরা! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জানে যে আজ রাত্রি পর্যন্ত সে বেঁচে থাকবে আর মরবে না,

সে যেন উঠে দাড়ায়।" কেউ দাড়ালো না। তিনি আবারো বললেন : "এখন তোমাদের মধ্য থেকে যে নিজেকে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত করেছে সে যেন উঠে দাড়ায়!" এবারো কেউ উঠে দাড়ালো না। অবশেষে আল্লাহর অলী বিস্ময়ের সাথে বললেন : "তোমাদের ব্যাপারে আমার অবাক হতে হয়, তোমরা দুনিয়াতে বেঁচে থাকার কোন নিশ্চয়তা পাচ্ছো না আবার যাবার জন্যেও প্রস্তুত নও।"[৩৪]

(৩৫)

ইহকালের পণ্য সামগ্রী সামান্য

[হিজরী তৃতীয় শতাব্দিতে খোরাসানের বিখ্যাত ও নামকরা যাহেদ ও আরেফ- অলী ছিলেন হযরত হাতেম আসাম (রহঃ)। এই মূল্যহীন দুনিয়া ও প্রজ্ঞা সম্পর্কিত তার কিছু মূল্যবান ও হৃদয় উদ্দীপক বক্তব্য খোরাসানীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি জনগণকে বেশী বেশী কোরআন পাঠ করতে উৎসাহ দিতেন। এ সাধক কোরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর আরেফ- অলীদের কাহিনী পাঠকে নাফসের পরিশুদ্ধতায় অত্যন্ত কার্যকর বলে মনে করতেন।]

বর্ণিত আছে যে, একদা বাগদাদ নগরীতে তিনি প্রবেশ করলে মুসলিম খলিফাকে সংবাদ দেয়া হয় যে, খোরাসানের যাহেদ এসেছেন। তাঁকে রাজদরবারে ডাকা হলে তিনি সে আহ্বানে সাড়া দেন। তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট খলিফাকে দেখেই সম্বোধন করলেন : "হে যাহেদ (বা অল্পতুষ্ট মানুষ) !"

মহামান্য খলিফা বলে উঠলেন : "আমি যাহেদ নই। কেননা সমগ্র পৃথিবী আমার ফরমানের তাবেদার। বরং আপনি যাহেদ। কারণ আপনিই তো অল্পতে সন্তুষ্ট আছেন আর দুনিয়ার কোন ধন- দৌলত সঞ্চয় করেন নি।"

হযরত হাতেম (রহঃ) : "না, হে খলিফা ! বরং তুমি যাহেদ। কারণ তুমি দুনিয়ার সবচেয়ে কম মূল্যবান এবং সর্বাপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের পণ্য সামগ্রী অর্জনেই সন্তুষ্ট হয়েছো। আসমানী কিতাব আল- কোরআন কি বলেনি যে, 'দুনিয়ার পণ্য সামগ্রী ও উপকরণ খুবই সামান্য' ? তুমি এর

চেয়ে বেশী কিছু অর্জন করতে পারনি আর আমার ভাগ্যে আল্লাহর যে সকল নেয়ামত রয়েছে তা তোমার অর্জিত পণ্যের চেয়ে অনেক বেশী। তাই যাহেদ বা অল্পতুষ্ট ব্যক্তি তুমি, আমি নই।"[৩৫]

(৩৬)

কুশলাদি বিনিময়

[মুহাম্মাদ ইবেন সিরিন, ইবনে সিরিন নামে খ্যাত ছিলেন। হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দির একজন মহান ফকিহ্, মুহাদ্দিস এবং স্বপ্নতাত্বিক। তাঁর জন্ম বসরা নগরীতে এবং সেই শহরেই একশত দশ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছিল। তিনি স্বপ্নের তাবিরে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর মা প্রথম খলিফার দাসী ছিলেন।]

একদা হযরত ইবনে সিরিন (রহঃ) জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন : "কেমন আছো?" লোকটি উত্তর দিলো : "যার পাঁচশত দেরহাম ঋণ আর তার পরিবারও আছে তার অবস্থা আর কেমন হতে পারে?" এ কথা শুনে কাল বিলম্ব না করে ইবনে সিরিন নিজ ঘরে ফিরে আসলেন। তিনি এক হাজার দেরহাম ঐ লোকটির হাতে দিয়ে বলেন : "পাঁচশত দেরহাম তোমার পাওনাদারকে বুঝিয়ে দাও, বাকী পাঁচশত দেরহাম দিয়ে সংসারের খরচ মিটাও। আমার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক, এরপর যদি আমি কারো কুশল জিজ্ঞেস করি!" বলা হলো : "আপনি তো তার ঋণ পরিশোধের জন্যে এবং সংসার খরচ মেটানোর জন্যে বাধ্য ছিলেন না।"

তখন তিনি বলেন : "যখন তুমি কারো কুশল জিজ্ঞেস করলে আর সে ব্যক্তি তার অবস্থার কথা ব্যক্ত করলো তখন যদি তার বিপদ মুক্ত করার জন্যে কোন ব্যবস্থা না কর তাহলে কুশলাদি বিনিময়ের নামে তুমি শুধু মুনাফিকি করলে।"[৩৬]

(৩৭)

অভ্যন্তরীণ শত্রু

মরুভূমিতে ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পিপাসায় কলিজা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মনে হয় দূর থেকে কোন কাফেলা এদিকে আসছে। তিনি তাদের নিকটবর্তী হলেন। তিনি বলেন : "তোমাদের কাছে পান করার মত কোন পানি আছে কি?"

তারা উত্তরে বলল : "আমাদের পনির মশকগুলোও শূন্য। আমাদের সঙ্গে আসুন, কিছুক্ষনের মধ্যে সামনে কোন জনবসতির সাক্ষাত নিশ্চয়ই পাবো।"

মরুভূমির লোকটি বলো : "আপনার আসবাবপত্রের মধ্যে একটি পাত্র দেখতে পাচ্ছি। ওটাও কি খালি?" কাফেলার লোকেরা বলো : "না, ওটা ভর্তি। তবে বিষ মিশ্রিত।"

লোকটি বলল : "বিষ কোথা থেকে এবং কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছো?"

তারা বলল : "যে শহরের দিকে আমরা যাচ্ছি সেই শহরের শাসনকর্তার অনেক শত্রু আছে। কোন কোন শত্রুকে তিনি তলোয়ার দিয়ে হত্যা করতে পারছেন না তাই বিষ দিয়ে হত্যা করতে পারবেন। কেননা সবাইকে তো আর তলোয়ার দিয়ে হত্যা করা যায় না?"

পথিক : "ওটা আমাকে দাও, আমারও এমন অনেক শত্রু আছে যাদেরকে তলোয়ারের আঘাতে ধরাশয়ী করা সম্ভব নয়। আশা করছি এই বিষ আমার অভ্যন্তরে অবস্থিত রক্তের দুশমনের উপর কার্যকরী হবে।"

পাত্রটি তুলে নিয়ে বিষ পান করতে উদ্যত হলে তারা বলো : "যদি পান করতে ইচ্ছে করেন তাহলে এর এক ফোটাই আপনার জন্যে যথেষ্ট। কেননা এই পাত্রের বিষ দিয়ে একটি বিশাল সৈন্য বাহিনীকে হত্যা করা সম্ভব।"

পথিক : "ঘটনাক্রমে আমার ভিতর যে দুশমন আছে তাও এক বিশাল সৈন্য বাহিনীর সমান হবে। কত মানুষকে যে এরা হত্যা করেছে, কত মানুষের যে রক্ত ঝরিয়েছে ও সম্মানহানী করেছে, আর এদের সাথে শত্রুতার কারণে কত লোক যে নিহত হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই।"[৩৭]

(৩৮)

আগুনের উপযুক্ত

[হিজরী তৃতীয় শতাব্দির নিশাপুরের হিরার অধিবাসী একজন আরেফ ও আল্লাহর অলীর নাম আবু ওসমান হিরী। তার কেরামতের কাহিনী লোকের মুখে মুখে। তিনি এক বিত্তশালী ও ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই দুনিয়ার ভোগবিলাস ও ধন- দৌলতের প্রতি তার মন ছিল না। তাই তিনি ইসলামী ইরফান বা আধ্যাত্মবাদের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।]

বর্ণিত যে, তিনি কোন এক পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অকস্মাৎ কেউ কোন এক বাড়ীর ছাদের উপর থেকে তার মাথার উপর এক গামলা ছাঁই নিক্ষেপ করে। অবস্থা পরিদর্শনে তাঁর সাথীরা রেগে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে। তারা শায়েস্তা করার নিমিত্তে ছাদের উপর থেকে ঐ লোকটিকে নামিয়ে আনার মনস্থ করলে হযরত আবু ওসমান বলেন :"হে আমার ভাইয়েরা! থামো, শান্ত হও। আল্লাহকে শত- সহস্র ধন্যবাদ যে ঐ লোকটা আমাদের উপর ছাইভস্ম ফেলেছে। আসলে আমরা যে (জাহান্নামের) আগুনেরই উপযুক্ত! আর যারা অগ্নিশিখার যোগ্য তাদের ছাই থেকে পালানো উচিত নয়।"[৩৮]

(৩৯)

অসহায়ের দোয়া

[আবুল হাসান বুশানজী খোরাসানের একজন মহান আলেম ও আবেদ ছিলেন। কিছুকাল তাঁকে তার শহর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। অবশেষে তিনি নিশাপুরে আসেন। তিনি হিজরী তিনশত আট চল্লিশ সনে এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।]

কিতাবে লেখা আছে যে একবার নিশাপুরে জনৈক এক ব্যক্তির একটি গাধা হারিয়ে গিয়েছিল। শত খোজা- খোজি করেও কোন লাভ হলো না। নিরুপায় হয়ে জনগণকে জিজ্ঞেস করলো : "আচ্ছা! নিশাপুরের সবচেয়ে আল্লাহ ওয়ালা লোক কে?"

তারা বলল : "আবুল হাসান।" সে ব্যক্তি এক দৌড়ে হযরত আবুল হাসান (রহঃ)- এর নিকট হাজির হয়ে গেল। তাঁকে দেখেই লোকটি বলে উঠলো : "আমার গাধা আপনি নিয়েছেন। আমার গাধা আমাকে ফিরিয়ে দিন।"

হযরত বললেন : "হে বাবা! তুমি ভুল করছো। আমি কখনো তোমাকে কোথাও দেখিনি আর তোমার গাধা কোথায় তাও আমি জানি না।"

গ্রাম্য লোকটি আবারো বলে উঠলো : "না আপনিই নিয়েছেন। যদি সেটা আমাকে ফিরিয়ে না দেন তাহলে চেচিয়ে লোকজনদের জানিয়ে দেবো, যেন তারা সকলে আপনাকে বাধ্য করে আমার গাধা ফিরিয়ে দিতে।"

আল্লাহর অলী হযরত আবুল হাসান (রহঃ) নিতান্তই অসহায় বোধ করলেন। তিনি চরম অসহায়ত্বের হালতে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বললেন : "হে আমার রব! আমাকে এই গ্রাম্য লোকটির হাত থেকে মুক্তি দাও।"

সাধকের মুনাজাত শেষ না হতেই অকস্মাৎ দূর থেকে একটি লোককে তার গাধা নিয়ে আসতে দেখা গেল। গ্রাম্য লোকটি তার গাধা চিনে নিজের আয়ত্বে নিয়ে নিলো। গাধাটি ফিরে পাওয়ার পর গাধার মালিক হযরত আবুল হাসানকে বলল : "হে শেইখ! আমাকে ক্ষমা করুন! আমি প্রথম থেকেই জানতাম আপনি আমার গাধা নেননি। তবে আমি জানতাম যে আমি দোয়া করলে কবুল হবে এই নিশ্চয়তা নেই। আমি চিন্তা করে দেখলাম যদি কোন আল্লাহ্ ওয়ালা লোককে দিয়ে দোয়া করাতে পারি তাহলে আমার গাধা পেয়ে যাবো। আর আমি তা- ই করেছি। আল্লাহ্ আপনার দোয়া কবুল করেছেন। আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন।"[৩৯]

(৪০)

নেক নিয়ত

নুতন জামা পরিধান করেছিলেন তিনি। তিনি সালাত আদায় করতে মনস্থ করলেন। তাই অযু করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তিনি প্রথমে শৌচাগারে গেলেন। সহসা সেখানে মনে পড়ে গেল যে তার এ নতুন জামাটা দান (সদকা) করে দিতে হবে। তৎক্ষনাত জামাটি শরীর থেকে খুলে শৌচাগারের দরজায় ঝুলিয়ে রাখলেন। অতঃপর বাইরে দাড়িয়ে থাকা সাথীদের মধ্যে একজনকে ডাকলেন। সাথী বলল : "হে শেইখ! আপনার হুকুম?"

শৌচাগারের ভিতর থেকে শেইখ বললেন : "এই ঝুলিয়ে রাখা জামাটি নিয়ে গিয়ে কোন মুখোপেক্ষী লোককে দান করে দাও।"

লোকটি বলল : "হে শেইখ! আপনি কি অপেক্ষা করতে পারতেন না? ওখান থেকে বেরিয়ে এসে সদকা দিতে পারতেন না?"

তখন আধ্যাত্মিক সাধক বললেন : "আমার ভয় হচ্ছে আমি বাইরে আসলে শয়তান আমাকে এই নেক নিয়ত থেকে ফিরিয়ে দেবে। নিয়তের উপর শয়তানের হস্তক্ষেপ করার ফলে আমার অনুতপ্ত হওয়ার পূর্বে এটাকে নিয়ে কোন গরীব লোককে দান করে দাও।"[৪০]

)৪১(

আত্মনির্ভরশীলতা

[আবু আবদুল্লাহ মাগরিবি একজন বিশিষ্ট ও বিখ্যাত আরেফ- অলী ছিলেন। তিনি মুরিদদের প্রশিক্ষণে যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। তার তরিকায় তাওয়াক্কুল (ভরসা) ও রিয়াযাত (কৃচ্ছ সাধন) অসামান্য গুরুত্বের অধিকারী ছিল। তিনি একশত বিশ বছর বেঁচে ছিলেন এবং দু'শত উনানব্বই হিজরীতে পরজগতে তার মা'বুদের সান্নিধ্যে চলে যান।]

বর্ণিত আছে যে, আবু আব্দুলাহ্ মাগরিবির চারজন পুত্র সন্তান ছিল। তিনি প্রত্যেককে এক একটি পেশায় প্রশিক্ষন দিয়েছিলেন। তার মুরিদরা বলেছিলো : "আপনার সন্তানদের পেশা ও কাজের কোন প্রয়োজন নেই। যতদিন পর্যন্ত তারা জীবিত থাকবেন ততদিন আপনার মুরিদেরা তাদের ভরণ- পোষন করবে।" এ কথা শুনে হযরত আবু আবদুল্লাহ্ : "আল্লাহ না করুন! এ রকমটি যেন না হয়। ওদের প্রত্যেককে এক একটি পেশায় নিয়োজিত করেছি যেন আমার মৃত্যুর পর আমার সন্তান হওয়ার কারণে অন্যের প্রিয়পাত্র না হয় এবং পিতার নাম ভাঙ্গিয়ে যেন না চলে।

যখনি ওরা প্রয়োজন অনুভব করবে তখনি যেন ওদের শেপাগত যোগ্যতা কাজে লাগাতে পারে।"[৪১]

(৪২)

মায়ের দোয়া

[মুহাম্মাদ ইবেন আলী তারমাযি (রহঃ) আল্লাহ ওয়ালা একজন আলেম এবং স্বনামধন্য আরেফ ছিলেন। তিনি তাঁর তরিকায় জ্ঞানার্জন ও ইরফান চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তাঁকে 'হাকিমুল আওলিয়া' বলা হয়ে থাকে।]

তিনি যৌবনকালে তাঁর দুই বন্ধুসহ জ্ঞান অর্জনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই অনেক চিন্তা- ভাবনা করে নিজ শহর থেকে হিজরত করে এমন এক জায়গায় যাওয়ার মনস্থ্ করলেন যেখানে জ্ঞানের বাজার ছিল খুব জমজমাট।

অবশেষে তিনি তাঁর মনের কথা তাঁর মাকে বললেন। মা এ কথা শুনে যার পর নেই দুঃখিত হলেন। মা হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আলী তারমাযিকে বলেন : "আমি দূর্বল এবং সহায়হীন বৃদ্ধা। তুমি আমার সাহায্যকারী। তুমি যদি চলে যাও আমি কিভাবে দিনকাল কাটাবো। তুমি আমাকে কার কাছে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছো?"

মায়ের কথা শুনে তাঁর অন্তরে ব্যথা অনুভব হলো। তিনি শহর ত্যাগ করার চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে দিলেন। তাঁর দুই বন্ধু তাঁকে ছাড়াই জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে শহর ত্যাগ করলো। কিছুকাল

এভাবেই পার হলো। হযরত শেইখ মুহাম্মাদ তারমাযি (রহঃ) শুধু অনুতাপ করতে থাকেন আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে থাকেন। একবার তিনি শহরের কোন এক গোরস্থানে বসে কাঁদছিলেন আর বলছিলেন : "আমি এখানে বেকার এবং জাহেল ও অজ্ঞ রয়ে গেলাম আর আমার বন্ধুরা জ্ঞান অর্জন করছে। যখন তারা ফিরে আসবে তখন তারা আলেম হিসেবে গণ্য হবে আর আমি তখন অজ্ঞ ও জাহেল রয়ে যাবো।"

হঠাৎ একজন উজ্জ্বল চেহারাসম্পন্ন বৃদ্ধ তাঁর মাথার কাছে এসে বললেন : "হে পুত্র! কেন কাঁদছো?" শেইখ তার অবস্থার কথা বর্ণনা করলেন।

বৃদ্ধ লোকটি বললেন : "তুমি কী চাও যে আমি প্রতিদিন তোমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিই যেন খুব শিগগির তুমি তোমার বন্ধুদের চেয়েও বেশী জ্ঞানী হয়ে যাও।"

শেইখ বললেন : "হ্যাঁ! আমি চাই।" অতঃপর সে বৃদ্ধ তাঁকে জ্ঞান দান করতে থাকলেন। এভাবে তিনটি বছর কেটে গেলো। পরে জানা গেল সেই বৃদ্ধ লোকটি ছিলেন হযরত খিজির (আঃ)।

শেইখ মুহাম্মাদ তাঁর মায়ের দোয়া ও সন্তুষ্টির কারণে এ মহা মর্যাদা অর্জনে ধন্য হয়েছিলেন।[৪২]

(৪৩)

ইবলিসের বন্ধু এবং শত্রু

আল্লাহর নবী হযরত যাকারিয়ার পুত্র হযরত ইয়াহিহয়া (আঃ) একদিন ইবলিসকে দেখে বললেন : "হে ইবলিস! তুমি কাকে সবচেয়ে বেশী দুশমন মনে করো আর কাকে বেশী ভালবাস ?"

ইবলিস উত্তরে বলল : "সৎ ও ধর্মপ্রাণ অথচ কৃপন ব্যক্তিকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। কেননা সে প্রাণপণে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকে। কিন্তু তার কৃপনতা ঐ সব ইবাদত বন্দেগীকে ব্যর্থ করে দেয়। আর পাপাচারী দাতাকে আমি সবচেয়ে বেশী শত্রু গণ্য করি। কারণ এই ব্যক্তি নিজেও ভাল জীবন-যাপন করে আর অন্যেকেও দান করতে কৃপনতা করে না। তাই আমার ভয় হয়, না

জানি ঐ লোকের দানের কারণে আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং তাওবা করার তৌফিক দান করেন।”[৪৩]

(৪৪)

পরনিন্দা ভাল নয়

একবার বনি ইসরাঈল গোত্রে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। মাটি শুকিয়ে চৌচির। শষ্যক্ষেতে আর ফসল ফলছে না। জনগণ নিরুপায় হয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইলো। তারা সকলে মিলে আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করলো। তারা বৃষ্টির নামাজ আদায়ের পরও মেঘের কোন রকম চিহ্ন আকাশে দেখতে পেল না।

হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। পরক্ষনে হযরত মুসা (আঃ)- এর কাছে অহি আসলো। বলা হলো : “হে মুসা! তোমাদের মাঝে একজন পরনিন্দাকারী আছে। যার কারণে তোমাদের দোয়া কবুল হচ্ছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত পরনিন্দাকারী তোমাদের মাঝে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো না।”

হযরত মুসা (আঃ) তার গোত্রের লোকজনের মাঝে ঘোষণা করে দিলেন : “যে ব্যক্তি পাপী এবং গিবত চর্চাকারী সে যেন এ সমাবেশ থেকে বের হয়ে যায়।”

অতঃপর দেখা গেল কেউ সে সমাবেশ থেকে বের হয়নি। হযরত মুসা বিষয়টির সমাধানের জন্যে আল্লাহর নিকট আরজ করলেন : “বারে ইলাহী! ঐ ব্যক্তিকে আমাদের মাঝে পরিচয় করিয়ে দাও যেন ওকে আমরা আমাদের মাঝ থেকে বিতাড়িত করতে পারি।”

আবারো অহি আসলো : “হে মুসা! আমি পরচর্চাকারীর দুশমন হয়ে কি করে আমি স্বয়ং পরচর্চা করতে পারি? কেমন করে অন্যের দোষ তোমার কাছে বলি?” চিন্তার রেখা আল্লাহর নবীর চেহারাতে ভেসে উঠলো। কি করবেন ভেবে না পেয়ে আবারো আল্লাহর কাছে আরজ করেন : “হে আমার রব! তাহলে এখন আমার করণীয়?”

আল্লাহ পুনরায় বলেন : "হে মুসা! তুমি সবাইকে বল সবাই যেন আমার কাছে তওবা করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, যেন তোমাদের মাঝে কেউ পরনিন্দুক না থাকে।"

অতঃপর হযরত মুসা (আঃ)- এর জাতির লোকেরা সকলে তাওবা করলে আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হয়।[৪৪]

(৪৫)

ইবলিসের রাগ

রাসূলে খোদার (সা.) আহলে বাইতের সদস্য হযরত আলী বিন হুসাইন যয়নুল আবেদীন (আঃ)- এর নিকট থেকে বর্ণিত যে একদা তিনি তাঁর ক্রীতদাসকে দু'বার উচ্চ স্বরে ডাকলেন কিন্তু তাঁর দাস কোন সাড়া দিল না। কোন উত্তরও দিলো না। তৃতীয়বার যখন ডাকলেন তখন উত্তর দিলে তাকে তিনি বলেন : "এর পূর্বের ডাকগুলো কি শুনতে পাওনি?"

দাস : "জি! শুনেছিলাম।"

ইমাম : "তাহলে উত্তর দাওনি কেন?"

দাস : "আপনার নেক ব্যবহার ও আচরণের কারণে নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করিনি এবং আমি জানতাম যে আপনি আমাকে কোন অত্যাচার করবেন না।"

ইমাম : "আল্লাহর শোকর! আমার দাস আমার কাছ থেকে নিরাপদ।"

ইমামের আরো একটি দাস ছিলো। একদিন সেই দাসটি ইমামের দুম্বার পা ভেঙ্গে দিয়েছিলো। ইমাম তাকে বলেন : "আচ্ছা! তুমি কেন এ কাজটি করলে?"

দাস : "ইচ্ছা করেই এমনটি করলাম যেন আপনি রাগান্বিত হয়ে যান।"

ইমাম : "তাহলে আমি এমন কাজ করবো, যে ব্যক্তি (ইবলিস) তোমাকে এমন কাজ শিখিয়েছে সে যেন রাগান্বিত হয়ে যায়।" দাস তো নিশ্চুপ। ইমাম কাল বিলম্ব না করে তাঁর ঐ দাসকে বিনামূল্যে আল্লাহর পথে মুক্ত করে দিলেন।[৪৫]

(৪৬)

সিংহ পুরুষ

জনৈক ব্যক্তি রাসূলে খোদা (সা.)- এর নিকট এসে বলল : "ঐ ব্যক্তিটি অত্যন্ত শক্তিশালী। লেকেরা বলে, 'যার সাথেই কুস্তি লড়ে তাকেই ভূ- পাতিত করে দেয় এবং তাকে পরাজিত করে বিজয়ের সম্মান কেড়ে নেয়।"

এ কথার জবাবে রাসূলে খোদা (সা.) বললেন : "শক্তিশালী ও পৌরুষ ঐ ব্যক্তি যে তার রাগের উপর বিজয়ী হয়, ঐ ব্যক্তি নয় যে অন্যকে মাটিতে ফেলে দেয়।"

কবির ভাষায় :

"সারিবদ্ধ প্রাণীকে ভূপাতিত করলেই হয় না সিংহ সিংহসম সেই, যে নিজের নফসকে পরাজিত করে ।"[৪৬]

(৪৭)

নেয়ামতের শোকরগুজারী

জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর এক বুযুর্গ বান্দার কাছে তার অভাবের কথা ব্যক্ত করলে তিনি বলেনঃ "দশ হাজার দেরহামের বিনিময়ে তুমি কি তোমার চক্ষুযুগল বিক্রি করে দিতে পছন্দ করবে ?"

লোকটি বলল : " তা কি করে হয়? আমার এই দু'চোখ সারা দুনিয়ার বিনিময়েও দিবো না।"

বুযুর্গঃ "তোমার বুদ্ধিবৃত্তি কি দশ হাজার দেরহামের সাথে বিনিময় করবে?"

অভাবী : "জী- না।"

বুযুর্গ : "তোমার হাত, পা আর কান?"

অভাবী : "কক্ষনো না।"

বুযুর্গ : "তাহলে শোন! আল্লাহ শত- সহস্র দেরহাম তোমাকে দান করেছেন। এর পরও অভাবের অভিযোগ। এখনো এমন অনেক লোক এ পৃথিবীতে বসবাস করছে যাদের অবস্থা তোমার চেয়ে

অনেক বেশী শোচনীয়। তুমি নিশ্চয়ই তাদের অবস্থার সাথে নিজের অবস্থার বিনিময় করবে না? সুতরাং যা তোমাকে দেয়া হয়েছে তা অনেকের চেয়ে অনেক বেশী দেয়া হয়েছে। তুমি এখনো এতসব নেয়ামতের শোকরগুজার করনি অথচ আরো নেয়ামতের আশা করছো ?! ”[৪৭]

(৪৮)

অভাবীর আর্তনাদ

কোন এক অভাবী পরিবারের কথা । দুঃখের শেষ নেই। দুঃখ- কষ্ট ছিল তাদের জীবনের নিত্য সঙ্গী। পরিবারের কর্তা অতি কষ্টে সন্তান- সন্ততি নিয়ে দিন যাপন করছেন। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন তাদের এই দুরাবস্থার কথা কোন এক আল্লাহর অলীকে ব্যক্ত করবেন। তিনি শুনে তাদের জন্যে দোয়া করবেন এই আশায়। আর তাঁর দোয়ার বরকতে তাদের সংসারের অভাব মিটে যাবে।

পরিশেষে পুরুষ লোকটি এলাকার স্বনামধন্য অলী দরবেশ হযরত বিশর হাফীর নিকট গমন করলেন। লোকটি হযরত বিশর হাফীকে আরজ করলো :

“হযরত! আপনি তো আল্লাহর প্রিয়জন। আমি আমার পরিবার নিয়ে খুব কষ্টে দিন কাটাচ্ছি। আমার অনুরোধ যে দয়া করে আপনি আমার জন্যে দোয়া করবেন।”

হযরত বিশর প্রতিত্তোরে বললেন : “হে আমার ভাই! যখন তোমার স্ত্রী সন্তানরা অনেক আশা করে তোমার কাছ থেকে খাবার অথবা পোশাক পরিচ্ছদ” কামনা করে আর তখন তুমি তা দিতে অপারগতা পোষন করো, সে সময় তুমি তোমার জন্যে দোয়া করবে। কেননা তখন তোমার দোয়া আমার চেয়ে বেশী কাজে লাগবে এবং আমার চেয়ে দ্রুততর আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে।

জেনে রেখো! সে অবস্থায় একজন মানুষের মনের নৌকা দুশ্চিন্তা ও ব্যথার সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকে। তখন কী তার সামনে মুক্তির সকল দুয়ার বন্ধ মনে হয় না? যে কেউ এহেন অবস্থায়

আল্লাহর কাছে হাত তোলে তখন তার দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে অন্যদের চেয়ে বেশী উপযুক্ত।"[৪৮]

(৪৯)

হতাশার বাণী

বর্ণিত আছে যে, বনি ইসরাইলের জনৈক আলেম তার জাতির লোকদেরকে আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ করে দিতেন। তিনি কাজকে মানুষের সামনে কঠিন করে উপস্থাপন করতেন। যে কেউ তার কাছে তাওবার জন্যে আসতো তাকেই তিনি নিরাশ করে দিতেন আর বলতেন "আযাবের অপেক্ষায় থাকো, আযাবের অপেক্ষায় থাকো।" অবশেষে একদিন সে আলেম লোকটি মারা গেলো। অনেকেই তাকে স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পেলো।

তারা জিজ্ঞেস করলোঃ "আল্লাহকে কেমন পেলেন?"

ঐ মৃত আলেম স্বপ্নে বললেনঃ "প্রতিদিন আমার কাছে শব্দ আসে, আমি তোমাকে আমার রহমত ও কৃপা থেকে বঞ্চিত ও নিরাশ করবো। কেননা পৃথিবীতে তুমি আমার বান্দাদের হতাশ করেছো।"[৪৯]

(৫০)

ধর্মজ্ঞানী বেদুঈন

একদা এক বেদুঈন রাসূলকে (সা.) প্রশ্ন করলো : "ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ক্বিয়ামতের দিনে কে আমাদের কাছ থেকে হিসাব নিকাশ নেবে ?"

আল্লাহর হাবীব বললেন : "আল্লাহ তায়ালা।"

আবারো জিজ্ঞেস করলো : "এই হিসেব স্বয়ং আল্লাহ নেবেন নাকি অন্য কারো উপর তিনি দায়িত্ব ন্যস্ত করবেন ?"

রাসূল(স.) : "স্বয়ং আল্লাহ।" বেদুঈন হেসে উঠলো। হাসির কারণ কী, জানতে চাইলেন আল্লাহর রাসূল(সা.)।

বেদুঈন : " হ্যাঁ, মহাদয়াবান যখন কাউকে হাতের নাগালে পান তখন তিনি ক্ষমা করেন, আর যখন তিনি হিসেব নেন তখন কঠিন করে নেন না।"

রাসূল(সা.) : "হ্যাঁ, সত্য বলেছো। পৃথিবীর কোন দয়াবানই আল্লাহর চেয়ে বেশী দয়াপরবশ নয়।"

অতঃপর তিনি বললেন : "এই বেদুঈন একজন ধর্মজ্ঞানী।"[৫০]

(৫১)

অন্যায় পথে উপার্জিত অর্থ ন্যায় পথে ব্যয় হয় না

একবার এক ব্যক্তি হযরত বিশর হাফীর সাথে পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলো : "আমার দুই হাজার দেরহাম আছে তা দিয়ে আমি হজ্বে যেতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার মত কী?"

হযরত বিশর বললেন : "তোমার হজ্বে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি পথের শহর- বন্দর তামাশা করা নাকি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা?"

লোকটি বলো : "আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই।"

হযরত বিশর : "যদি এই হজ্ব তোমার জন্যে ফরজ না হয়ে থাকে তাহলে এ অর্থ গরীব, মিসকিন, ইয়াতিম ও ঋণগ্রস্থ মুসলিম পরিবারগুলোর মধ্যে দান করে দাও। ফলে তারা দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে।"

লোকটি বলল, হজ্বে যাওয়ার ব্যাপারে মন বেশী সায় দিচ্ছে। এ কথা শুনে হযরত বিশর (রহঃ) বলেন : "হ্যাঁ, পরিস্কার হয়ে গেছে। এ অর্থ সঠিক পথে অর্জন করনি বলে সঠিক পথে খরচ করতে পারছো না। যে অর্থ ন্যায় পথে অর্জিত নয়, সেই অর্থ ন্যায় পথে ব্যয় হয় না।"[৫১]

(৫২)

অহংকর পতনের মূল

একবার কোন এক স্থানে হযরত বিশর বিন মানসূর সালাত আদায় করছিলেন। জনৈক ব্যক্তি তাঁর পাশে বসে তাঁর সালাত লক্ষ্য করছিলো। ঐ ব্যক্তিটি মনে মনে বিশরকে অত্যন্ত প্রশংসা করতে লাগলো আর নিজের অবস্থা স্মরণ করে হায় আফসোস! হায় আফসোস করতে লাগলো। সেজদা ও রুকুর দীর্ঘতা আর সালাতে তাঁর এহেন ধ্যানমগ্ন অবস্থা দেখে সেই লোকটি বিষ্ময়াভূত হয়ে যায়। অন্তর দিয়ে ঐ ব্যক্তিটি বলতে লাগলো , "সাব্বাস! এটাই তো বান্দার কাজ।"

হযরত বিশর সালাত সমাপ্ত করে লোকটির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বললেন : "এই সাহসী মানুষ! বিস্মিত হয়ো না। আমি এমন একজনকে চিনি যে একসময় সালাতে দাড়ালে ফেরেস্তারা পর্যন্ত তার পেছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাড়িয়ে যেতো। আর এখন তার অবস্থা এমন যে জাহান্নামীরা পর্যন্ত তার প্রতি ঘৃনা পোষন করে। লোকটি বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলো, সে কে ? সে হচ্ছে ইবলিস! হযরত বিশর বললেন। তাই তো কোন এক বুযুর্গ বলেছেনঃ "সারারাত যদি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দাও আর সকালে আল্লাহর ভয়ে অন্তর কম্পিত থাকে, এটা ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম যে রাত্রিভর ইবাদত বন্দেগীর পর প্রভাতে অহংকার ও আত্মতুষ্টির শিকার হয়ে যায়। এ বিশ্বে সর্বপ্রথম যে পাপ প্রকাশিত হয় তা ছিল শয়তানের অহংকার।"[৫২]

(৫৩)

আল্লাহর প্রতি সম্মানের প্রতিদান

[বিশর ইবনে হারেস(রহঃ) ছিলেন মারভের অধিবাসী। তবে তিনি তার জীবনের শুরু থেকে মৃত্যু অবধি বাগদাদেই অতিবাহিত করেছেন। এখন যে ঘটনাটি নিচে উল্লেখ করবো সেটি ছিলো তার তওবার কারণ। আর এই তওবা করেই তিনি বিশ্বখ্যাত আরেফদের মধ্যে গণ্য হতে পেরেছিলেন।]

একদা হযরত বিশর ইবনে হারেস কোথাও যাচ্ছিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি পথিমধ্যে এক টুকরো কাগজ দেখতে পেলেন। তাতে লেখা ছিলো “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম” । তিনি সে কাগজটি অতি যত্নের সাথে মাটি থেকে তুলে ভালোভাবে চুমু খেলেন। অতঃপর সামনের একটি দোকান থেকে এক শিশি আতর ক্রয় করলেন। তিনি কাগজটিকে আতর দিয়ে মেখে খুব সম্মানের সাথে রাস্তার পাশে এক দেয়ালে গুঁজে রাখলেন। এই ঘটনাটি কেউ জানতে পারলো না। তিনি পথচলা অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে গন্তব্য স্থলে পৌছে তিনি রাতে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। রাত যখন প্রায় শেষের দিকে তখন তিনি স্বপ্নে দেখতে পেলেন কে যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তিনি অবাক হয়ে সেই আওয়াজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।
অদৃশ্য থেকে তাকে বলা হচ্ছে : “হে বিশর! তুমি আমার নাম সুগন্ধযুক্ত এবং সম্মানিত করেছো। সে কারণে আমিও দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার নাম সম্মানিত করবো।” একথা শেষ হতেই হযরত বিশর ঘুম থেকে জেগে উঠলেন আর এভাবেই তিনি সাধনার সিঁড়িপথ বেয়ে ইরফানের উচ্চ মাক্বামে পৌছুতে পেরেছিলেন।[৫৩]

(৫৪)

বিন্দু বিন্দু জল

দুম্বার কোন অভাব ছিলো না তার। কয়েক শত দুম্বা চড়ানোর জন্যে এই আল্লাহর বান্দা একজন রাখাল নিয়োগ করলো। রাখাল ছেলেটি দুম্বা চড়ানো ছাড়া দুধ দোহানের কাজটিও করতো। আর এভাবে প্রতিদিন সে নিষ্ঠার সাথে দুধ মালিকের হাতে তুলে দিতো। তবে দুষ্ট মালিক প্রতিদিন সে দুধের সাথে পানি মিশিয়ে বাজারে বিক্রি করে আসতো। কিন্তু রাখাল ছেলেটি ছিলো একজন ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী মানুষ। সে মালিককে এই অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে সবসময় গুরুজনদের উপদেশবাণী শোনাতো। কিন্তু মালিক রাখালের ভাল কথায় কোন কর্ণপাত করেনি। সে প্রতিদিন একই কাজ করে যাচ্ছিলো। কিন্তু রাখালের মনে কোন সুখ ছিলো না।

কোন একদিনের কথা। অন্যান্য দিনের মত আজও রাখাল দুম্বাগুলোকে মাঠে চড়াতে ও ঘাস খাওয়াতে মরুভূমিতে নিয়ে এসেছে। বেলা যখন প্রায় দুপুর তখন সে দুম্বাগুলোকে মাঠে রেখে পাহাড়ের উপর চলে আসে। এখানে বসে সে পশুগুলোর তদারকি করছিলো। কোথাও কোন বাধা নেই। দুম্বাগুলো আপন মনে চড়ে বেড়াচ্ছিল আর কখনো মে ... মে বলে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলছিলো। এভাবে বেলা গড়িয়ে যখন বিকেল হয়ে আসে তখন আকস্মিকভাবে আকাশ গর্জন করা শুরু করে দেয়। সাথে সাথে আকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সেদিন তাড়াতাড়িই অন্ধকার চলে আসে। আর রাখাল ছেলেটির কিছু বুঝার আগেই শুরু হয়ে যায় প্রবল বর্ষণ। সে পাহাড় থেকে নেমে আসতে না আসতেই পাহাড়ী ঢলে দুম্বাগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। রাখাল তো কিংকর্তব্যবিমুঢ়। যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। রাখাল ছেলেটির আর কিছু করার থাকলো না। মনের দুঃখে মালিকের বাড়িতে ফিরলো সে। বাড়িতে রাখালকে খালি হাতে দেখে মালিক জিজ্ঞেস করে : "কি ব্যাপার! আজকে যে আমাদের জন্যে দুধ আনলে না?"

রাখাল : "হে মনিব! আমি আপনাকে কতবার বলেছি যে দুধে পানি মেশাবেন না। কিন্তু আপনি সে কথায় ভ্রুক্ষেপও করেন নি। আমি বলিনি এভাবে জনগণের সাথে প্রতারণা করবেন না? আজকে দুধে মেশানো আপনার সেই জলবিন্দুসমূহ একত্রিত হয়ে প্লাবনের আকার ধারন করেছিলো। সেই প্লাবনের ঢল আপনার দুম্বাগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।"[৫৪]

কবির ভাষায় :

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।

(৫৫)

স্বপ্নের প্রেমিক

[শাহ্ সোজাহ্ কেরমানী ছিলেন হিজরী তৃতীয় শতাব্দির একজন খ্যাতনামা আরেফ। তাকে শাহ্ বলা হয় এ কারণে যে কিছুকাল তার পিতা পারস্যের কেরমান প্রদেশের আমির ছিলেন। তিনি হিজরী দুই শত সত্তুর সনে এ নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চিরস্থায়ী জগতে পদার্পন করেন।]

কথিত যে তিনি চল্লিশ বৎসর অনিদ্রায় কাটিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি যখন নিদ্রায় যান স্বপ্নে আল্লাহকে অবলোকন করেন। আল্লাহর সাক্ষাৎ পেয়ে তো তিনি খুশীতে বাগ বাগ। তবে স্বপ্নেই তিনি আল্লাহকে প্রশ্ন করেন :

“হে মহান প্রতিপালক ! জাগ্রত অবস্থায় আমি তোমাকে কতই না খুজেছি, আর এতকাল পর নিদ্রাবস্থায় আমি তোমাকে পেলাম !!?”

প্রতিত্তোরে দয়াবান আল্লাহ বললেন : “হে আমার বান্দা ! ঐ দীর্ঘ জাগ্রতবস্থার কারণেই তো আমাকে এই স্বপ্নে পেয়েছো। যদি তোমার জীবনে সেই দীর্ঘ অনিদ্রা না থাকতো তাহলে আজকে এরকম স্বপ্ন তুমি দেখতে না।” সে রাত্রিতে আল্লাহর সাথে এর বেশী আর কোন কথপোকথন হয়নি। তার পর দিন থেকেই তিনি তার মাশুকের প্রেম মিলনের আকাঙ্খায় আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যেখানেই যেতেন সঙ্গে একটি বালিশ রাখতেন। তিনি চাইতেন ঘুম আসলেই কালবিলম্ব না করেই যেন সেই বালিশের উপর দেহ এলিয়ে দিতে পারেন। আর এভাবে তিনি যেন আবারো স্বপ্নে আল্লাহকে দেখতে পান। সেই স্বপ্নের পর থেকে তিনি প্রায় বলতেনঃ “হায় ! ওরকম স্বপ্ন যদি আমি জীবনে আর একবার দেখতাম !” তিনি একেবারে স্বপ্নের প্রেমিক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সর্বদা একটি কথা উচ্চারণ করতেন : “বিশ্বব্যাপি প্রাণী জগতের সকল অনিদ্রার বিনিময়ে হলেও ঐ একটু স্বপ্ন হাতছাড়া করতে আমি প্রস্তুত নই।”[৫৫]

(৫৬)

পুণ্যবানের দোয়া

আধ্যাত্মিক জগতে হযরত ইব্রাহিম আদহামের নাম কে না জানে। তিনি ছিলেন আধ্যত্মিক মহাকাশের একটি বিশাল নক্ষত্র। আধ্যাত্মিক সাধকদের মধ্যে তার খ্যাতি অসাধারণ। একদিন তিনি তাঁর কিছু ভক্তকে সাথে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর একজন নিন্দুক তাকে পাথর মেরে মাথা ফাটিয়ে দিলো। কালবিলম্ব না করে তিনি ঐ পাথর নিক্ষেপকারীর জন্যে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া করলেন। তাঁর সফর সঙ্গীরা হুজুরের দোয়া দেখে হতবাক !

তারা বলে উঠলেন : "হে বুযুর্গ ! আপনি এমন এক লোকের জন্যে দোয়া করছেন যে আপনাকে আঘাত করেছে !?

হযরত আদহাম(রহঃ) তাদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন : "ঐ ব্যক্তিটি তার জুলুম ও আঘাত দিয়ে আমার দিকে পুণ্য ছুড়ে দিয়েছে। আর আমি এখন ঐ সব পুণ্যের ভাগ্যবান যা তার কাছ থেকে এসেছে। সে তো শুধু তার নিজের ক্ষতিই করেছে আর আমার নেকির পালা ভারী করেছে। তাই আমি এই সওয়াবের প্রতিদান হিসেবে দোয়া ছাড়া আর কি দিতে পারি ?"[৫৬]

(৫৭)

শ্রেষ্ঠ আমানতদার

একবার জনৈক আরব ব্যক্তি দ্বিতীয় খলিফা ওমর বিন খাত্তাবের (রাঃ) পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলো। খলিফা ঐ ব্যক্তির কোলে একটি শিশু বাচ্চা দেখে অবাক হয়ে বললেন : "হে পথিক! আজ পর্যন্ত আমি কখনো দু'জন আদম সন্তানকে একই আকৃতিতে পাইনি। এই শিশুটি দেখতে যে অবিকল তোমার মতো?"

পথিক উত্তর দিলো : "হে খলীফা! আপনি জানেন না, এ শিশুটি সম্পর্কে আরো কত বিস্ময়কর ঘটনা আছে!"

খলিফা : “তাহলে একটি বিস্ময়কর কাহিনী শোনাও।”

পথিক : একবার আমি দেশের বাইরে কোন এক দূরের দেশে ভ্রমনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তখন এ শিশুটির মা অন্তঃসত্ত্বা ছিলো। আমার সফরে যাওয়ার কথা শোনে শিশুটির মা বলে উঠলো, হে আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী! আমাকে তুমি একা ফেলে ভ্রমনে গমন করছো?

আমি তখন প্রতিত্তোরে বলেছিলাম, তোমার গর্ভের সন্তানকে আমি আল্লাহর উপর সোপর্দ করে যাচ্ছি। আর এভাবে আমি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। অতঃপর আমি যখন ভ্রমন শেষে দেশে ফিরে এলাম দেখতে পেলাম যে শিশুটির জন্মের পূর্বেই তার মা মৃত্যুবরণ করেছে। তখন আমার আফসোস করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলো না। কয়েকদিন আমার মন ভীষণ খারাপ থাকে। একদিন আমি বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বসে গল্প করছিলাম। এমন সময় দূর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা আমাদের সকলকে তাক লাগিয়ে দেয়। আমি বন্ধুদেরকে জিজ্ঞেস করলাম : “ব্যাপার কী ?”

তারা বলল এ অগ্নি শিখা তোমার মৃতা স্ত্রীর সমাধিস্থল থেকে বের হচ্ছে। আমি অবাক কন্ঠে বলাম : “আমার স্ত্রী তো আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে কোন ত্রুটি করেনি। মানুষের অধিকার নষ্ট করেনি। আর কখনো বেপর্দা হয়নি। কখনো ভুলেও সালাত তরক করেনি। তাহলে কেন এমনটি হচ্ছে?” কোন সন্তোষজনক উত্তর কেউ দিতে পারলো না।

এমনিভাবে কয়েকদিন অনবরত আগুনের ধোয়া আমার জিজ্ঞাসা আরো বাড়িয়ে তোললো। একদিকে বিস্ময় আর অপরদিকে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম কবর খুড়ে দেখবো। যেই কথা সেই কাজ। কবর খুড়ে দেখতে পেলাম এক আশ্চর্য দৃশ্য। একটি বাতি কবরের ভিতর জ্বলছে আর তার আলোতে এ কোলের শিশুটি খেলছে। আমি এ শিশুটিকে কোলে তুলে নেয়া মাত্রই আসমান থেকে এক গায়েবী আওয়াজ আসে : “এ শিশুটিকে আমার কাছে সোপর্দ করে গিয়েছিলে আর তাই ওকে এখন তোমার কাছে ফিরিয়ে দিলাম। যদি শিশুটির মাকেও আমার কাছে তুলে দিতে তাহলে আজকে তাকেও তোমার কাছে ফিরিয়ে দিতাম।”[৫৭]

(৫৮)

নেকড়ে বাঘের ভয়

হযরত ইয়াকুব (আঃ) বহু বছর তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয় সন্তান হযরত ইউসুফের বিরহে অনেক কেদেছিলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে শেষ পর্যন্ত অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অবশেষে অনেক ঘটনার চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে হযরত ইউসুফের জামা হযরত ইয়াকুবের চোখে যখন রাখা হয় তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।

একদিন মহাক্ষমতাবান আল্লাহ হযরত ইয়াকুবের সঙ্গে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে কথোপকথন করলেন। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন : "হে আমার বান্দা ইয়াকুব! তুমি কি জানো কেন ইউসুফকে এত বছর তোমার কাছ থেকে দূরে রেখেছিলাম ?"

উত্তরে হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেন : "না, হে আমার প্রতিপালক।"

আল্লাহ : "তার কারণ হচ্ছে, তুমি যে বলেছিলে আমার ভয় হয় নেকড়ে বাঘ ইউসুফকে খেয়ে ফেলতে পারে। হে ইয়াকুব ! কেন নেকড়ে বাঘের ভয় পেয়েছিলে অথচ আমার উপর ভরসা করনি? তুমি ইউসুফের ভাইদের বেখেয়ালীর খেয়াল রেখেছিলে অথচ আমার হেফাজতের বিষয়টি খেয়াল করনি ! ?"[৫৮]

(৫৯)

প্রেমময় সৃষ্টিকর্তার ভালবাসা

বর্ণিত আছে, মুশরিকদের সাথে রাসূলে পাকের (সা.) কোন এক যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে একটি শিশু বন্দি হয়। শিশুটিকে একটি পৃথক জায়গায় সংরক্ষিত রাখা হয়েছিলো। সকল বন্দির ব্যাপারে রাসূলে খোদার সিদ্ধান্তই ছিলো চুড়ান্ত। কিন্তু শিশুবন্দি সহ বন্দিদের বসার স্থানে মাথার উপর কোন ছাউনি ছিলো না। তখন ছিলো গ্রীষ্মকাল। রোদের প্রচন্ড উত্তাপ। সকলেই গরমে ভীষণ কষ্ট ভোগ করছিলো। বন্দিদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিলো। বন্দি শিশুটির উপর এ

মহিলার দৃষ্টি পড়তেই তার অন্তরে অত্যধিক এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। অকস্মাৎ সে মহিলা সকলকে অবাক করে প্রচন্ড বেগে শিশুটির দিকে দৌড়াতে শুরু করে। আর তার আশে পাশের বন্দিরাও তার পিছু ছোটতে থাকে। এক পর্যায়ে দেখা গেলো মহিলাটি শিশুকে কোলে নিয়ে নিজের বুকের সাথে মিশিয়ে রেখেছে। আর সে নিজে নত হয়ে শিশুটির জন্যে ছায়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বন্দিসহ রাসূলের সাহাবীরা বিস্ময়ের সাথে তাকিয়ে দেখছে মহিলা কেঁদে কেঁদে তার শিশুকে আদর করছে আর গুণ গুণ করে বলছেঃ “এ শিশু আমার ছেলে, এটা আমার আদুরে বাচ্চা ...”। মহিলাটির এ ধরনের মাতৃত্ববোধ ও স্নেহসুলভ আচরণ দেখে বন্দিরাসহ সাহাবীরা সকলে অভিভূত হয়ে যায়। তারা সবাই শিশুর মায়ের এ ধরনের আত্মত্যাগ দেখে আবেগ আপ্লুত হয়ে দু'নয়ন দিয়ে অশ্রু ঝড়াচ্ছিলো। তারা সকলে কিছুক্ষনের জন্যে সকল কিছু ভুলে গিয়েছিলো। সন্তানের প্রতি মায়ের এ ধরনের ভালবাসা সকলকে বিস্ময়াভূত করে দেয়। কিছুক্ষনের মধ্যেই আল্লাহর প্রিয় বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ(সা.) সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সকলে তাঁকে ঘটনাটি বর্ণনা করে শোনালো। তিনি মায়ের ভালবাসা ও মুসলমানদের ক্রন্দনের কথা শোনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি উপস্থিত মুসলমানদেরকে জিজ্ঞেস করেন : “তোমরা কী এ মহিলার মাতৃসুলভ ভালবাসা ও আচরণে অবাক হয়েছো ?”

সকলে বলো : “ জী, ইয়া রাসুলালাহ্! ”

অতঃপর কালক্ষেপন না করেই মহানবী (সা.) বলেন : “আল্লাহ তায়ালা এ শিশুটির উপর মায়ের ভালবাসার চেয়েও তার সকল বান্দাদেরকে অনেক অ- নে- ক বেশী ভালবাসেন। ” সেদিনের মত মুসলমানরা অন্য কোন দিন এত বেশী খুশী ও আনন্দ উপভোগ করেনি।[৫৯]

(৬০)

মূর্তির লজ্জা

হযরত ইউসুফ (আঃ) যৌবনকালে অনেকদিন মিসরের বাদশাহর হাতে ছিলেন বন্দি। বন্দি অবস্থাতেই তাঁর সৌন্দর্য ও গুণের সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি আযিযে মিসরের পরমা সুন্দরী স্ত্রী জুলাইখাও তাঁর দর্শনে মুগ্ধ হয়ে প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন।

একদিন বাদশাহর স্ত্রী জেলখানা থেকে হযরত ইউসুফকে ডেকে এনে সম্মানের সাথে তার একান্ত কক্ষে আসন করে দেন। বাদশাহর স্ত্রীর যে মতলব খারাপ তা হযরত ইউসুফ (আঃ) মোটেই টের পাননি। তাকে আপন করে পাবার নেশায় মত্ত জুলাইখা। কিন্তু আল্লাহর কি শান। জুলাইখা হযরতকে অবৈধ যৌনচর্চার আহ্বান জানানোর পূর্বে সে তার কক্ষে সংরক্ষিত পূজিত মূর্তিটির উপর একটি কাপড় ছড়িয়ে দেয় যেন তার অবৈধ কাজটি মূর্তির চোখের সামনে না ঘটে। এ ঘটনা পরিদর্শনে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হযরত ইউসুফ (আঃ) জুলাইখার উদ্দেশ্যে বলেন : "হে জুলাইখা ! তুমি এ পাথরের তৈরী একটি জড় মূর্তির কাছে লজ্জা পাচ্ছো আর আমি আমার মহান প্রতিপালক, সাত আসমান ও জমিনের মালিকের কাছে কি করে লজ্জিত হবো না ? তিনি যে সব কিছু শোনেন এবং সকল কিছু দেখেন !"[৬০]

(৬১)

নিয়তের ফলাফল

দূর্ভিক্ষ দেশের সর্বস্তরের বহু মানুষকে অপরিমিত দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করে দিয়েছিলো। সে সময়ে কোথাও কোন ফসল ফলছিলো না। এক টুকরো রুটির সন্ধানে মানুষ হণ্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতো। এরি মধ্যে বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তি ঘুরতে ঘুরতে মরুভূমির এক প্রান্তে একটি পাহাড়ের পাদদেশে এসে হাজির। এ পাহাড়টিকে ঘিরে রেখেছে অসংখ্য ছোট বড় নুড়ি পাথর। লোকটি ভাবতে লাগলো :

“হায়রে কপাল! যদি এ পাহাড়ের উপর নুড়ি পাথর না থেকে সম পরিমান গমের দানা থাকতো তাহলে আমি তা দিয়ে আমার জাতির লোকদের ক্ষুধা নিবারন করাতে পারতাম।” সে এ কথা ভাবতে ভাবতে পুনরায় শহরের দিকে ফিরে আসতে লাগলো। বনি ইসরাইলের গোত্রে আল্লাহ শত- সহস্র নবী প্রেরণ করেছিলেন। লোকটি যখন নগরীতে পৌছলো তখন তৎকালীন আল্লাহর নবী তাকে জিজ্ঞেস করেন : “এই যে ভাই! আপনি শহরের বাইরে কী দেখলেন আর কী চাইলেন?”

সে লোকটি উত্তরে বলো : “শহরের বাইরে আমি একটি বিশাল পাহাড় আর তাকে ঘিরে অসংখ্য নুড়ি পাথর দেখতে পেলাম। তখন আমি আপন মনে ভেবেছিলাম, হায় যদি এগুলো নুড়িপাথর না হয়ে গমের দানা হতো তাহলে তা আমার জাতির লোকদের জন্যে নিয়ে যেতে পারতাম এবং তা দিয়ে তাদের ক্ষুধা নিবারন করাতে পারতাম।”

লোকটির কথা শুনে বনি ইসরাইলের নবী বললেন : “তোমার জন্যে সুসংবাদ। কিছুক্ষন পূর্বে আল্লাহর ফেরেস্তা আমাকে জানালেন যে আল্লাহ তায়ালা তোমার দোয়া কবুল করেছেন। আল্লাহ ঐ পাহাড় পরিমান গমের দানার সমতুল্য নেকী তোমাকে দান করেছেন।”[৬১]

(৬২)

সুস্থ কে

একদা হযরত ইসা (আঃ) একটি পথ অতিক্রমকালে এমন এক লোকের সাক্ষাত পেলেন যে ছিলো বহু ধরনের রোগে আক্রান্ত। তার না ছিলো দৃষ্টি শক্তি, না ছিলো পায়ে চলার বল। তিনি দেখতেও পারতেন না আর হাটতেও পারতেন না। কুষ্ঠ রোগে তার দেহ ছিলো জরাকীর্ণ। রাস্তার এক পাশে অসাঢ় হয়ে পড়ে থাকা লোকটিকে আবাক হয়ে দেখছিলেন আল্লাহর নবী হযরত ইসা (আঃ)।

এত কিছুর পরও সে লোকটি গুণ গুণ করে বলে যাচ্ছিলোঃ "হে আমার প্রভু ! তোমাকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। কেননা তুমি যে আমাকে সুস্থ রেখেছো আর করেছো রোগমুক্ত।" এ কথা শুনে হযরত ইসা (আঃ) যার পর নেই অবাক হলেন। তিনি রুগ্ন লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন : "হে আল্লাহর বান্দা ! আর কোন্ রোগ নেই যে তোমাকে ধরেনি, যে জন্যে তুমি আল্লাহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো ?"

রুগ্ন ব্যক্তি : "হে ইসা নবী ! জেনে রেখো আমার সুস্থতা ঐ ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশী যার অন্তরে হাক্বতায়ালার কোন মা' রেফাত নেই।"

হযরত ইসা(আঃ) : "হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো।"

অতঃপর ইসা নবী ঐ লোকটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। আল্লাহর রহমতে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। ইতিহাসে আছে, তিনি এরপর সুস্থভাবে বহু দিন বেঁচে ছিলেন আর মৃত্যু অবধি আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দিয়েছিলেন।[৬২]

[যে অন্তরে আল্লাহর স্মরণ নেই সে অন্তর রুগ্ন অন্তর। আর রুগ্ন অন্তরের মানুষ দৈহিকভাবে সুস্থ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সে- ই রোগী। তার উচিত আরোগ্য কামনা করা। অপর পক্ষে যার অন্তরে আল্লাহর পরিচয় বা মারেফাত বিদ্যমান, আল্লাহর স্মরণে যে অন্তর সিক্ত তার দেহ কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে সে- ই সুস্থ।]

(৬৩)

জ্ঞানীর দুঃখ

একবার দার্শনিক প্লেটো আপন মনে নিরবে বসে কি যেন ভাবছিলেন। সহসা এক ব্যক্তি তার পাশে এসে বসলো। বসেই সে গল্প শুরু করে দিলো। অনেক কথা বললো সে। লোকটি শুধু বলেই যাচ্ছিলো আর তিনি শুনেই যাচ্ছিলেন।

এক পর্যায়ে লোকটি দার্শনিক প্লেটোকে বলো : "হে মহান দার্শনিক ! হে প্রজ্ঞাবান ! আজকে এমন একজন লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম যে আপনার জন্যে শুধু দোয়াই করে যাচ্ছিলো, আর সে আপনার প্রশংসায় ছিলো পঞ্চমুখ। সে বলছিলো, জনাব প্লেটো এমন একজন মহান ব্যক্তি যার মত পৃথিবীতে কোন মানুষ জন্মায়নি আর জন্মাবেও না। আমি তার প্রশংসার বাণী আপনাকে জানাতে এসেছি।"

প্লেটো তাঁর নিজের সম্পর্কে এ ধরনের প্রশংসার কথা শুনে যার পর নেই অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি মাথা অবনত করে ভাব গম্ভীরভাবে কাঁদতে লাগলেন। দার্শনিকের কান্না দেখে উপস্থিত লোকটি থতমত খেয়ে গেলো। অবশেষে অনেক কষ্টে বুকে সাহস নিয়ে বিনয়ের সাথে সে জনাব প্লেটোকে জিজ্ঞেস করে : "হে মহোদয় ! আমার কাছ থেকে এমন কি বেয়াদবী হয়েছে, যে কারণে আপনি এমন দুঃখ পেয়েছেন ?"

উত্তরে দার্শনিক প্লেটো বললেন : "তোমার কাছ থেকে আমি কোন কষ্ট পাইনি। তবে এর চেয়ে বড় মুসিবত আর কি হতে পারে যে, একজন মূর্খ ব্যক্তি আমার প্রশংসা করবে এবং তার কাছে আমার কাজ পছন্দনীয় হবে ? জানি না, আমি এমন কোন্ অজ্ঞ কাজ করে ফেলেছি যা তার কাছে ভাল লেগেছে, যার কারণে সে আমার প্রশংসা করেছে ? আমার দুঃখ এখানেই যে, আমি এখনো মূর্খ ও অজ্ঞ রয়ে গেছি। কেননা, জাহেলের প্রশংসা জাহেলই করে থাকে।"[৬৩]

(৬৪)

জানা আর দেখা সমান নয়

একদা হযরত আবু সাইদ আবুল খাইর(রহঃ) নিশাপুরের এক ওয়াজ মাহিফল শেষে নিজ গৃহের দিকে রওয়ানা হয়েছেন। পথিমধ্যে তৎকালীন খ্যাতনামা দার্শনিক ও বিজ্ঞ চিকিৎসাবিদ আবু আলী সিনার সাথে তার সাক্ষাত ঘটে। এর পূর্বে তারা কখনো পরস্পরকে স্বচক্ষে দেখেননি। যদিও তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পত্র বিনিময় হয়েছিলো। হযরত আবুল খাইর আবু আলী

সিনাকে নিজ গৃহে আমন্ত্রন জানালেন। হযরত আবু আলী সিনা নিমন্ত্রন গ্রহণ করলে হযরত আবুল খাইর সম্মানের সাথে তাকে স্বাগতম জানালেন। তার জন্যে বহু সুস্বাদু খাবারের আয়োজনও করলেন তিনি। তারা দু'জন একান্ত নিরিবিলি আলাপ আলোচনা করলেন তিন দিবা রাত্রি। এ তিন দিন নিশাপুরের জনগণ তাদেরকে মসজিদে জামায়েতের নামাজে ছাড়া অন্য কোথাও দেখেনি। তিন দিন তিন রাত পর যখন হযরত আবু আলী সিনা শহর ত্যাগের নিমিত্তে শেইখের গৃহ থেকে বের হলেন তখন তার ছাত্ররা তাকে ঘিরে ধরলো।

তারা খাজা আবু আলীকে জিজ্ঞেস করলো : "শেইখ আবুল খাইরকে আপনি কেমন দেখলেন ?" উত্তরে আবু আলী সিনা বলেন : "আমি যা জানি শেইখ (দিব্য শক্তি বলে) তা দেখেন।" অপরদিকে শেইখের মুরীদরা খাজা আবু আলী সিনা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : "আমি যা দেখি তিনি তা জানেন।"[৬৪] হ্যাঁ, জানা আর দেখার মধ্যে আছে অনেক তফাৎ।

(৬৫)

বন্ধুর পরিচয়

[যুন নুন মিসরী ছিলেন ইসলামী ইরফানের একজন অগ্রদূত। একবার আব্বাসীয় জালিম খলীফা আল্ মুতাওয়াক্কিল তাকে কুফরী ও বেদ্বীনির অভিযোগে কারাবন্দি করে। কিন্তু কিছুদিন পর তার বিভিন্ন ইরফানি ও আধ্যাত্মিক কথাবার্তা শুনে তাকে কারামুক্ত করে দেয়। হযরত যুন নুন (রহঃ) হিজরী দু'শত পয়তাল্লিশ সনে পরলোকগমন করেন।]

যখন তিনি মস্তিষ্ক বিকৃতি ও বেদ্বীনির অভিযোগে কারাবন্দি জীবন যাপন করছিলেন তখন একদিন তার কিছু ভক্তবৃন্দ তাকে কারাগারে দেখতে আসে। হযরত যুন নুন তাদেরকে দেখে জিজ্ঞেস করেন তোমরা কারা? তারা সকলে উচ্চ কন্ঠে উত্তর দিলো, আমরা আপনার মুরীদান। আমরা আপনার শুভাকাঙ্খী।

হযরতও উচ্চ স্বরে তাদেরকে বকাবকি করে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাই তাদের দিকে ছুড়ে মেরেছেন। হযরতের এহেন অবস্থা পরিদর্শনে মুরীদরা সকলে ছুটে পালালো। কিছুক্ষনের মধ্যেই হযরত আবারও লোকশূণ্য ও কোলাহল মুক্ত হয়ে গেলেন।

লোকজন সকলে চলে গেলে হযরত হেসে ফেললেন। তিনি দুঃখের সাথে মাথা নেড়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেনঃ "তোমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। তোমরা বলছো তোমরা আমার ভক্ত। না, তোমরা ঠিক বলনি। যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে আমার প্রেমিক হতে তাহলে আমার পক্ষ থেকে আরোপিত কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করতে আর আমাকে ত্যাগ করতে না। হ্যাঁ, বন্ধুর পক্ষ থেকে আরোপিত কষ্ট বন্ধু বুকে পেতে নেয়, তাকে ত্যাগ করে না।"[৬৫]

(৬৬)

গোলামের কৃতজ্ঞতা

একবার কোন এক শহরের এক মনিব খাওয়ার জন্যে তার গোলামের হাতে একটি তিতো ফল তুলে দিলেন। দাস সম্মানের সাথে ফলটি গ্রহণ করেই তৃপ্তভরে খাওয়া শুরু করে দিলো। কি মজা ও সুস্বাদু ফল। এমন মজা ফল কেউ কখনো খেয়েছে কিনা মনিবের জানা নেই।

গোলামের খাওয়া দেখে মনিবের লোভ হলো। এখান থেকে একটু ফল খেতে পারলে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করা হবে, ভাবতে লাগলেন মনিব। তিনি নিজেকে বলতে লাগলেন আমার দাস যেভাবে তৃপ্তির সাথে ফলটি খাচ্ছে নিশ্চয়ই তা অত্যন্ত মিষ্টি ও সুস্বাদু হবে। তাই তিনি দাসকে বললেন : "হে আমার প্রিয় দাস! তুমি যে ফলটি এত তৃপ্তির সাথে খাচ্ছো তা থেকে আমাকে একটু দাও। আমিও তোমার মত সুস্বাদু ফল খেতে চাই।" দাস তার মনিবের নির্দেশ মোতাবেক ফলের অর্ধেক তার মনিবকে ফেরত দিলো।

মনিব ফলটি হাতে পেয়ে আর দেরী না করে দাত দিয়ে ফলটিতে কামড় দিলো। যেই মনিব ফলটি মুখে পুড়েছে অমনি এক বিভৎস চেহারার মাধ্যমে ফলটিকে ছুড়ে ফেলে দিলো। তিনি ফলটি মুখে

দিয়েই বুঝতে পেরেছিলেন যে আসলে ফলটি অত্যন্ত তিতো। এ অবস্থায় তিনি খুব বিরক্ত বোধ করলেন। কিন্তু করার কিছুই তার ছিলো না। শুধু তিনি তার দাসকে ধমক দিয়ে বললেন : "এরকম তিতো ফল এরকম তৃপ্তির সাথে খাচ্ছিলে?"

তখন গোলাম বিনয়ের সাথে উত্তর দেয় : "হে মনিব ! আমি আপনার কাছ থেকে কত যে মিষ্টি ফল খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। এখন যে তিতো ফল আমাকে খাবার জন্যে দিয়েছেন কেমন করে আমি তা বিরক্তের সাথে প্রত্যাখ্যান করি? এ কাজ যে সৎসাহস ও দাসত্বের বরখেলাফ! এ অল্প তিক্ততার উপর ধৈর্যধারণ আপনার পক্ষ থেকে আগত অসংখ্য সুখকর ও সুস্বাদু মিষ্টি ফলের কৃতজ্ঞতারই শামিল।"[৬৬]

(৬৭)

মঙ্গলময় আঘাত

একদা এক দরবেশ গ্রামের একটি সরু পথ দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি কিছু দূরে একটি গাছের ছায়ায় নিদ্রারত অবস্থায় একটি যুবকে দেখতে পান। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষন হলো ঐ যুবকটির উপর । তিনি যখন দূর থেকে মনযোগ দিয়ে যুবকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন দেখতে পান যে ঐ যুবকের দিকে একটি বিষাক্ত সাপ ধেয়ে ছুটছে। তিনি দ্রুত যুবকের দিকে ছুটে চললেন।কিন্তু তাঁর পৌছার পূর্বেই সাপটি যুবকের মুখ দিয়ে পেটের ভিতর চলে যায়।

সাধক চিন্তা করে দেখলেন যদি এ মুহুর্তে যুবককে সাপের সংবাদ দেয়া হয় তাহলে সে ভয়েই মারা যাবে। তাই তিনি একটি বিকল্প চিন্তা করলেন। তিনি একটি লাঠি দিয়ে ঘুমন্ত যুবকের গায়ে আঘাত করতে শুরু করলেন। যুবক ঘুম থেকে জাগ্রত হলো ঠিকই কিন্তু একেবারে আধমরা। দরবেশের হাতে পিটুনি খেয়ে সে আর উচ্চ বাক্য করার সাহস পেলো না। তিনি যুবককে আঘাত করেই চলছেন।

অবশেষে যখন বুঝতে পারলেন এখন যদি যুবককে কিছু বলা হয় তাহলে সে নির্দ্বিধায় তা মেনে নেবে তখন তিনি নির্দেশ দিলেন গাছের নিচে পড়ে থাকা পচাঁ ফলগুলো খেতে। যুবক নিরূপায় হয়ে দরবেশের কথা মেনে যাচ্ছিলো। সে ভয়ে ও আতংকে পচাঁ ও দুর্গন্ধময় ফলগুলো খাচ্ছিলো আর দরবেশকে গালিগালাজ করছিলো। সে পচাঁ ফলগুলো খেতে খেতে বলছিলো : "কি দুঃসময় আমার! আমি আজ তোমার পালায় পড়েছি। তুমি আমার মধুর ঘুম ভেঙ্গে দিয়ে নির্যাতন চালাচ্ছো। আল্লাহ তোমার বিচার করুক।" কিন্তু দরবেশ যুবকের কোন কথারই ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তিনি লাঠি দিয়ে আঘাত করছিলেন আর সে যুবক পচাঁ ফল খেয়েই যাচ্ছিল। একদিকে পচাঁ ফল আর অন্যদিকে গলা পর্যন্ত খাওয়া। কাজ যা হবার তাই হলো। অবশেষে যুবকের ভীষণ বমির উদ্রেক হয়। এক পর্যায়ে সে এতক্ষন যা খেয়েছিলো তা বমি করে বের করে দেয়। যুবকের তখনই টনক নড়ে যখন সে দেখতে পায় তার মুখ দিয়ে এক বিষাক্ত সাপ বের হয়ে এসেছে। এ বিষধর সাপ দেখে যুবকের স্বস্থিত ফিরে এলো। সে বুঝতে পারে এত আঘাত, এত কষ্ট ভোগ কি জন্যে?

এবার সে বলতে লাগলো : "আমার কপাল ভালো যে আমি একজন বিদ্বান ও মঙ্গলকামী লোকের হাতে পড়েছিলাম।" সবশেষে যুবক সকল কিছু বুঝতে পেরে দরবেশের পা জড়িয়ে ধরে। সে বুঝতে পারলো এ পৃথিবীতে এমন অনেক দুঃখ ও কষ্ট আছে যার কারণে একজন মানুষের জীবন সুখকর হয়ে উঠতে পারে। কেননা এর মাধ্যমে তার অভ্যন্তরীণ বিষাক্ত সাপকে বের করার এক সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়।[৬৭]

(৬৮)

ষ্টেশন, গন্তব্যস্থল নয়

বর্ণিত আছে যে একদিন হযরত ইয়াহিহয়া ইবনে মায়াজ আপন প্রভুর ধ্যানে যখন ছিলেন মগ্ন তখন তারই দু'জন বন্ধুর আগমনে তার ধ্যানচ্যুতি ঘটে। বন্ধু দু'জন পরস্পর বিভিন্ন বিষয়ে অনেক

কথা বললেন। হযরত খুব ধৈর্য ধরে তাদের কথা শ্রবন করছিলেন। এক পর্যায়ে তাদের একজন অপরজনকে বলেন : "এ দুনিয়া যেহেতু মৃত্যুর সাথে ওতপ্রতভাবে জড়িত তাই এর এক কানা কড়িও মূল্য নেই।"

উত্তরে অপরজন বলেন : "এ দুনিয়া খুবই আনন্দময় হয়ে উঠতো যদি এর মাঝে মৃত্যু না থাকতো।" যখন তাদের কথোপকথন এ পর্যায়ে এসে উপনীত হয় তখন হযরত ইবনে মায়াজ মুখ খুললেন।

তিনি বললেন : "আমার বন্ধুরা! তোমরা ভুল বলছো। মৃত্যু যদি না থাকতো তাহলে এ দুনিয়ার কোন মূল্যই হতো না।"

তারা বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলেন, "আমাদেরকে এর কারণ বলে দিন হে মহান!"

তখন তিনি বললেনঃ "মৃত্যু এমন একটি সেতু বন্ধন যার মাধ্যমে বন্ধু বন্ধুর সাক্ষাতে ধন্য হয়। এটা কী কেউ চায় যে সে আজীবন তার মা'শুকের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হোক ? মৃত মানুষের অনুতাপ এটা নয় যে সে কেন মৃত্যুবরণ করেছে। বরং তাদের অনুতাপ হচ্ছে কেন তারা রসদ ছাড়া এসেছে ?! মৃত্যু তোমাকে কুয়া থেকে তুলে উন্মুক্ত মরুভূমিতে ছুঁড়ে মারে আর খাঁচা থেকে করে দেয় মুক্তি।

মৃত্যু যাত্রাপথের শুরু, শেষ নয়। প্রভাত, সন্ধ্যা নয়। ষ্টেশন, গন্তব্যস্থল নয়।"[৬৮]

(৬৯)

স্মৃতি ভুলে যেও না

অনেক অনেক দিন আগের কথা। একবার আল্লাহর এই জগতের এক অংশে ঘটেছিলো এক আশ্চর্য ঘটনা। ঘটনাক্রমে কোন এক দেশে এক রাখাল রাজ্যের প্রধান উজিরের পদ লাভ করেন। তখনকার দিনে প্রধান উজিরের পদটির গুরুত্ব আজকের প্রধান মন্ত্রির পদের ন্যায় ছিল। কিন্তু সেই রাখাল দেশের এত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পদের অধিকারী হওয়া সত্বেও প্রতিদিন নিজের পূর্বের

বাড়ীটিতে কিছুক্ষন অবস্থান নিতেন। তিনি নিয়মিত কিছুক্ষন সেখানে কাটিয়ে অবশেষে রাজ দরবারে বাদশাহর হুকুমের অপেক্ষায় থাকতেন। এভাবে তার অনেক দিন কেটে যায়।

একদিনের ঘটনা। সরকারের গুপ্তচররা জনাব উজিরের এ ধরনের কার্যকলাপ বাদশাহর কর্ণগোচর করে। তারা বাদশাহকে বলে : "জনাব উজির প্রতিদিন একান্ত গোপনে তার পূর্বের বাড়ীতে কিছুক্ষন নিঃসঙ্গ সময় কাটান। তার এ কাজের ব্যাপারে কেউ কোন কিছু অবগত নয়।"

গুপ্তচরদের রিপোর্ট শ্রবন করে বাদশাহর মনে সন্দেহের সৃষ্টি হলো। তিনি স্বয়ং ব্যাপারটি দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। তাই নিত্যদিনের ন্যায় উজির যখন তার পুরাতন বাড়ীতে নিঃসঙ্গ সময় কাটাচ্ছেন তখন অতর্কিতে একদিন তিনি সেই বাড়ীতে ঢুকে পড়েন। উজিরের কক্ষে প্রবেশ করা মাত্রই তার চোখে ধাঁধা লেগে যায়। বাদশাহ নিজের চোখের প্রতি সন্দেহ করতে লাগলো। তিনি যা দেখছেন ঠিক দেখছেন তো ? তিনি উজিরকে দেখতে পেলেন যে, উজির সাহেব রাখালের পোশাক পড়ে লাঠি নিয়ে রাখালের আওয়াজ তুলছেন।

অবাক কন্ঠে প্রশ্ন করলেন বাদশাহ্ : "আমি এ কি দেখছি, উজির ?"

উজির একেবারে বুঝতেই পারেননি যে এখানে বাদশাহ্ উপস্থিত আছেন। তিনি প্রথমে হতচকিত হয়ে যান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে উত্তর দিলেনঃ "জি, আপনি যা দেখছেন ঠিকই দেখছেন। আমি এখানে প্রতিদিন আসি। যেন আমার জীবনের শুরুর কথা ভুলে না যাই এবং কাজে কর্মে ভুল না করে বসি। কেননা যে তার জীবনের দূর্বল সময়গুলোর স্মৃতি মনে রাখে শক্তিমত্তার সময়ে অহংকার তাকে আক্রমন করতে পারে না।"

বাদশাহ্ তার উজিরের এমন প্রজ্ঞাময় কথা শুনে একেবারে 'থ' হয়ে গেলেন।[৬৯]

(৭০)

সমুদ্রের মানুষ

একবার দূর থেকে আগত একজন অপরিচিত লোক হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর (রহঃ) খেদমতে হাজির হলেন। তিনি হযরতকে বললেন : "হে বায়েজিদ! কেন তুমি অন্যত্র হিজরত করছো না? কেন দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছো না? কেননা এতে করে তোমার দু'টি লাভ হবে। এক : লোকজন তোমার কাছ থেকে উপকৃত হতে পারবে। দুই : তুমিও পূর্বের চেয়ে আরো বেশী পরিপক্ক ও পোক্ত হতে পারবে।

কবির ভাষায় :

কাচা মানুষ সফর না করে পোক্ত হয় না আর জামের মুখ না খুললে সাফ মানুষ সুফি হয় না।"

সব শুনে হযরত বায়েজিদ বললেন : "আমার এ শহরে বসবাসের কারণ আমার এক বন্ধু। আমি তার খেদমতে থাকাটাকে নিজের জন্যে ফরজ মনে করি। আমি সর্বদা তারই সেবায় নিয়োজিত। আর তাকে ছাড়া আমি অন্য কিছু চিন্তাও করতে পারি না।"

আগন্তুক : "পানি যদি এক জায়গায় আবদ্ধ হয়ে যায় এবং বের হওয়ার সুযোগ না পায় তাহলে তা সেখানেই পচে দুর্গন্ধ ছড়ায়।"

উত্তরে হযরত বায়েজিদ (রহঃ) বলেন : "সমুদ্র হয়ে যাও। তাহলে কখনো পচবে না।"[৭০]

(৭১)

কম কথার আনন্দ

একদা হযরত লোকমান হাকিম তার পুত্রকে নির্দেশ দেন : "হে বৎস! আগামীকাল থেকে তুমি ক'দিন রোজা রাখবে। আর সারা দিন মুখ দিয়ে যা বলবে তা লিখে রাখবে। অতঃপর রাত্রিতে ইফতারীর পূর্বে তোমার লেখাগুলো আমাকে পড়ে শোনাবে। শোনানো শেষ হলে তুমি পানাহার করতে পারবে।"

প্রথম রাত্রিতে হযরত লোকমানের পুত্র নিজ লেখা বাবাকে পড়ে শোনালেন। লেখা পড়তে পড়তে রাত পার হয়ে যায়। সে রাত্রে ছেলে কিছু না খেয়েই রোজার নিয়ত করে। দ্বিতীয় রাত্রেও একই কান্ড ঘটলো। তৃতীয় দিনেও না খেয়ে রোজা রাখলেন। তৃতীয় দিনেও যা কথপোকথন করেছিলেন তার সব কিছু নোট করে রাখলেন। পিতার কাছে তা পড়ে শোনাতে শোনাতে আবারো রাত পার হয়ে গেলো। এবারো কিছু না খেয়ে রোজা রাখলেন। চতুর্থ দিনে হযরতের ছেলে কোন কথাই বললেন না। চতুর্থ রাতে পিতা যখন লেখাগুলো পড়ে শোনাতে বললেন তখন তার পুত্র বললেন : "বাবা! আজকে আমি কোন কথাই বলিনি যে লিখে রাখবো।"

তখন হযরত লোকমান (আঃ) বললেনঃ "হ্যাঁ, তাহলে এসো। দস্তরখানাতে এই যে রুটি দেখছো খেয়ে নাও। আর জেনে রেখো রোজ ক্বিয়ামতে যারা কম কথা বলেছে তাদের এমন আনন্দ অনুভব হবে যেমনটি তুমি এখন অনুভব করছো।"[৭১]

(৭২)

পালানোর উপায় নেই

[হযরত হাসান বসরী(রহঃ) হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দির একজন খ্যাতনামা দরবেশ ও দুনিয়াত্যাগী আলেম ছিলেন। তিনি মদিনা নগরীতে জন্ম গ্রহণ এবং বসরা নগরীতে বড় হন। তিনি সরাসরি ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়ার খেলাফতের বিরোধীতা করেছিলেন। তিনি কয়েকবার পত্রের মাধ্যমে উমাইয়্যা বংশের কঠোর অত্যাচারী শাসক আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানকে তার নির্যাতন ও জুলুমের ব্যাপারে সাবধান করে দেন। হযরত আত্তার নিশাপুরী তার "তাযকিরাতুল আউলিয়া" গ্রন্থে হযরত হাসান বসরী সমন্ধে লিখেছেন : "তিনি একশত ত্রিশ জন সাহাবীর সহচর্য লাভ করেছেন এবং সত্তর জন বদরী সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হযরত আলী (আঃ)- এর উপর তার ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান ছিলো।]

বর্ণিত যে, তিনি যৌবনকালে একবার রোম শহরে যান। সেখানে তিনি রোমের প্রধান মন্ত্রির সাথে সাক্ষাত করেন। প্রধান মন্ত্রি তাকে বলেনঃ “আমরা আজকে এক জায়গায় যাবো। তুমি কি আমাদের সাথে আসতে পারবে?”

হযরত হাসান বসরী এ প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিলে তারা সকলে একটি মরুভূমিতে গমন করলেন। এ সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী বলেন : “আমি সেখানে রেশমী কাপড়ের তৈরী একটি রঙিন তাবু দেখতে পেলাম। যার রশিগুলো ছিলো রেশমী সুতার আর পেরেকগুলো ছিলো সোনালী রঙের। সেখানে দেখলাম এক বিশাল সেনাবাহিনীর সমাবেশ। তারা বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রে সজ্জিত ছিলো। তারা বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে ঐ তাবুর চতুর্দিকে প্রদক্ষিন করে এক সময় ফিরে গেলো।

অতঃপর দার্শনিকবৃন্দ ও বিভিন্ন শাস্ত্রের পন্ডিতরাও একই রকম আচরণ করলেন। তারাও বিভিন্ন শ্লোগান দিতে দিতে ঐ তাবুর চারপাশ ঘুরে অবশেষে চলে গেলেন। এবার আসলেন রাষ্ট্রের সবচেয়ে সম্মানিত ও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গ। দেখলাম তারাও আগের লোকদের মত ঐ খিমার চতুর্দিকে ঘুরে চলে গেলেন। তাদের পরে রাজ দরবারের অপরূপ সুন্দরী ও চন্দ্রময়ী দাসীরা বিভিন্ন প্রকার অলংকার ও গহনাদি পরিধান করে পূর্ববর্তী লোকদের মত আচরণ করে প্রত্যাবর্তন করলেন। সবশেষে রোম সম্রাট কাইসার ও তার প্রধান মন্ত্রিও অনুরূপ কার্য সম্পাদন করে ইতি টানলেন।”

হযরত হসান বসরী বলেনঃ “আমি তো হতবাক! কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তাই অবশেষে মন্ত্রি মহোদয়ের কাছ থেকে এ ধরনের কাজের কারণ জানতে চাইলাম।”

প্রধান মন্ত্রি বললেনঃ “তাহলে শুনুন, হে হাসান বসরী! রোম সম্রাট কাইসারের এক সুদর্শন পুত্র ছিলো। তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানে ছিলেন অপূর্ব ধরনের পারদর্শী। আর যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন অপরাজেয়। পিতা কাইসার ছিলেন তার আশেক। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! হঠাৎ সেই ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। একেবারে বিছানায়।

রাজ্যের যত চিকিৎসক ছিলো কারো চিকিৎসাই কোন ফল দিলো না। পরিশেষে সেই বিছানাতেই রাজপুত্র মৃত্যুবরণ করলেন। এই যে তাবু দেখছেন, এ তাবুর ভিতরে রাজপুত্রকে সমাহিত করা

হয়। প্রতি বৎসর তার মৃত্যু বর্ষপূর্তিতে দেশের গণ্য মান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এখানে আসেন। প্রথমে যে সৈন্যদলকে দেখলেন তারা উচ্চ স্বরে বলছিলো : "হে রাজপুত্র! যদি আমাদের সৈন্যবল ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আপনার এ পরিণতি (মৃত্যু) ঠেকানো যেতো তাহলে আমরা সকলে আপনার জন্যে নিজেদেরকে উৎসর্গ করতাম। কিন্তু এ পরিণতি এমন একজনের হাতে নির্দ্ধারিত যার মোকাবেলায় সকল কিছু ভোতা হয়ে যায়।" এসব শ্লোগান দিয়ে তারা চলে গেলো।

আর দার্শনিক ও পন্ডিতরা বললেন : "হে আমাদের মহামান্য বাদশাহর পুত্র! যদি আমাদের দর্শন শাস্ত্র, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা কোন কাজে আসতো তাহলে আমরা তা অকাতরে আপনার জন্যে বিলিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করতাম না।" এ কথাগুলো বলে তারাও চলে গেলেন।

অতঃপর বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিরা এসে বললেন : "হে শাহজাদা ! যদি আমাদের সুপারিশ ও আর্তনাদ অথবা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আপনার এ পরিণাম ঠেকাতে পারতো তাহলে আমরা আপনাকে অবশ্যই জীবিত অবস্থায় পেতাম। কিন্তু হায়! এটা এমন একজনের কাজ যিনি এসব সুপারিশ ও আর্তনাদের ধার ধারেন না।"

তারপর সুন্দরী দাসীরা তাদের সোনালী বাহারের প্রদর্শনী দেখিয়ে বলেছিলেন : "হে মালিকজাদা! যদি আমাদের সৌন্দর্য, রূপ ও অলংকারাদি কোন কাজে আসতো তাহলে আমরা তা উৎসর্গ করতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতাম না।"

সবশেষে সম্রাট তার উজিরের সাথে তাবুর কাছে আসলেন। তিনি বললেন : "হে প্রাণ প্রিয় পুত্র! আজকে পিতার কাছে তুমি কি আশা করছো? তোমার পিতা তোমার জন্যে বিশাল সৈন্যবাহিনী, দার্শনিক ও পন্ডিতবর্গ, অভিজ্ঞ ও সম্মানিত বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ এবং সুন্দরী ও রূপসী সব দাসী এনে উপস্থিত করেছে। কিন্তু এ পরিণতির মালিক তিনি। যার কাছে তোমার পিতার সকল শান-শওকাত ও মর্যাদা তুচ্ছ গণ্য। তোমাকে জানাই সালাম। আবার এক বৎসর পর।" তিনি এ কথাগুলো বলে সেখান থেকে ফিরে এলেন।"

কথিত আছে, এ ঘটনা পরিদর্শনে হযরত হাসান বসরীর (রহঃ) অন্তর এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলো যে তিনি বসরা নগরীতে ফিরে এসে আর অন্য কোন দিকে মন না দিয়ে একমাত্র আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আশায় কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।[৭২]

টীকা

১। ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মাদ গাজ্জালী ; ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন, কিতাব আত্ তাওবা, ফারসী ভাষায় অনুবাদঃ হুসাইন খাদিভজাম, পৃঃ নং ৪৩। প্রাগুক্ত; কিম্ইয়া- ইসায়াদাত, পৃঃ নং ৬৫৪।

২। ফারিদুদ্দীন আত্তার নিশাপুরী; ইলাহী নামা (মাসনাভী), সংশোধনে : ফুয়াদ রুহানী, পৃঃ নং ৭১- ৭২।

৩। শেইখ আবুল হাসান খারাক্বানী; নুরুল উলুম, প্রচেষ্টায় : আব্দুর রাফিয়’ হাক্বিক্বাত, পৃঃ নং ৮১।

৪। ফিহ্ মা ফিহ্ (মাওলানা জালালুদ্দিন রুমীর কথোপকথন সংকলন), সংশোধনে : বাদিউজ্জামান ফুরুজানফার, পৃঃ নং ১১৩।

৫। ডঃ মুহাম্মাদ ইসতি’ লামী; গুযিদেয়ে তাযিকরাতুল আওলিয়া, পৃঃ নং ৪৫।

৬। প্রগুক্ত; গুযিদেয়ে তাযিকরাতুল আওলিয়া, পৃঃ নং ২৯৮- ২৯৯।

৭। আত্তার নিশাপুরী; তাযিকরাতুল আওলিয়া, পৃঃ নং ৫০৮। আবুল ফাদল রাশিদুদ্দীন মুবিদী; কাশফুল আস্রার ওয়া উদ্দাতুল আবরার, খণ্ড ১, পৃঃ নং ৩৭৭। আবু ইসহাক্ব ইব্রহিম ইবনে মানসুর নিশাপুরী; ক্বিসাসুল আম্বিয়া, পৃঃ নং ৬৫।

৮। ইবনু ফাতিক; মুখতারুল হিকাম ওয়া মাহাসিনুল কিলাম, পৃঃ নং ৭৩।

৯। প্রাগুক্ত; তাযিকরাতুল আওলিয়া, পৃঃ নং ১৮৫।

১০। শেখ সা'দি; বুস্তান, পৃঃ নং ৫৯। আত্তার নিশাপুরী; মুসিবাত নামা, পৃঃ নং ৩০৭।

১১। খাজা নিজামুল মুলক; সিয়াসাত নামা, পৃঃ নং ৬৪। ইমাম মুহাম্মাদ গাজ্জালী; নাসিহাতুল মুলুক, পৃঃ নং ৯৭।- ৮৬

১২। কিকাভুস ইবনে ইসকান্দার; ক্বাবুস নামা, বাব নং ২৮, পৃঃ নং ১৪২। ক্বাফত্বি; তারিখুল হুকামাহ্, পৃঃ নং ২৮৪।

১৩। প্রাগুক্ত; তাযিকরাতুল আওলিয়া, পৃঃ নং ২৩৫।

১৪। ঐ,   সংশোধনে : ইসতি’ লামী, পৃঃ নং ১০২।

১৫। ঐ,   পৃঃ নং ১০৩।

১৬। জালালুদ্দিন হুমায়ী;   গাজালী নামা,   পৃঃ নং ৪০৩।

১৭। প্রাগুক্ত;   কাশফুল আসরার ওয়া ইদ্দাতুল আবরার, খণ্ড ১,   পৃঃ নং ৪২৩।

১৮। প্রাগুক্ত;   ক্বাবুস নামা,   পৃঃ নং ২৬১।

১৯। মুহাম্মাদ ইবনে মুনাওয়ার ইবনে আবি সাইদ;   আসরারুত্ তাওহীদ ফি মাক্বামাতিশ্ শেইখ আবু সাইদ আবুল খাইর,   পৃঃ নং ১১৬- ১১৭।

২০। প্রাগুক্ত;   তাযিকরাতুল আওলিয়া,   পৃঃ নং ৬১৫।

২১। প্রাগুক্ত;   আসরারুত্ তাওহীদ,   পৃঃ নং ২২৭।

২২। ঐ,   পৃঃ নং ২০৩।

২৩। ঐ,   পৃঃ নং ২১৩।

২৪। ঐ,   পৃঃ নং ২১৫।

২৫। ঐ,   পৃঃ নং ২১৬।

২৬। ঐ,   পৃঃ নং ১৯৯।

২৭। প্রাগুক্ত;   তাযিকরাতুল আওলিয়া,   পৃঃ নং ৩৫১।

২৮। মাওলানা আব্দুর রাহমান জামী;   নাফাহাতুল উনস্ মিন্ হাদারাতিল কুদুস,   আবদুল্লাহ্ ইবনে খাবিক্কের আধ্যাত্মিক হালত বর্ণনা অধ্যায়।

২৯। প্রাগুক্ত;   তাযিকরাতুল আওলিয়া,   পৃঃ নং ২১৬।

৩০। প্রাগুক্ত;   গুযিদেয়ে তাযিকরাতুল আওলিয়া,   পৃঃ নং ২২২।

৩১। ঐ,   পৃঃ নং ২২৩।

৩২। ঐ,   পৃঃ নং ২৪০।

৩৩। ঐ,   পৃঃ নং ১৬০।

৩৪। ঐ,   পৃঃ নং ১৪৭।

৩৫। ঐ, পৃঃ নং ২০১- ২০২।

৩৬। প্রাগুক্ত; কিম্ইয়া- ই- সায়াদাত, খণ্ড ১, পৃঃ নং ৪৪০।

৩৭। ফিহ্ মা ফিহ্ , পৃঃ নং ১১৮।

৩৮। প্রাগুক্ত; গুযিদেয়ে তাযিকরাতুল আওলিয়া, পৃঃ নং ৩২৪- ৩২৫।

৩৯। প্রাগুক্ত; তাযিকরাতুল আওলিয়া, পৃঃ নং ৩৫৬- ৩৫৭।

৪০। প্রাগুক্ত; গুযিদেয়ে তাযিকরাতুল আওলিয়া, আবুল হাসান বুশানজীর বর্ণনা প্রসঙ্গ।

৪১। ঐ, পৃঃ নং ৩৯১।- ৮৭

৪২। ঐ, পৃঃ নং ৩৫৯।

৪৩। প্রাগুক্ত; কিম্ইয়া- ই- সায়াদাত, খণ্ড ২, পৃঃ নং ১৭২।

৪৪। ঐ, খণ্ড ২, পৃঃ নং ৯৮- ৯৯।

৪৫। ঐ, খণ্ড ২, পৃঃ নং ৫৪১।

৪৬। ঐ, খণ্ড ২, পৃঃ নং ৫৪০।

৪৭। ঐ, খণ্ড ২, পৃঃ নং ৩৮০।

৪৮। ঐ, খণ্ড ২, পৃঃ নং ৪২৮।

৪৯। ঐ, খণ্ড ২, পৃঃ নং ৩৮৭।

৫০। ঐ, খণ্ড ২, পৃঃ নং ৩৯৩।

৫১। ঐ, খণ্ড ২, পৃঃ নং ৩১২- ৩১৩।

৫২। ঐ, খণ্ড ২, পৃঃ নং ২৭৭।

৫৩। ইমাম আবুল ক্বাসেম আব্দুল কারিম নিশাপুরী; রিসালাহ্ ক্বাশিরিয়্যা, বাব- ২, পৃঃ নং ৩২।

৫৪। প্রাগুক্ত; ক্বাবুসনামা, পৃঃ নং ১৭২।

৫৫। প্রাগুক্ত; গুযিদেয়ে তাযিকরাতুল আওলিয়া, পৃঃ নং ২৫০- ২৫১।

৫৬। প্রাগুক্ত; কিম্ইয়া- ই- সায়াদাত, খণ্ড ২, পৃঃ নং ২৫- ২৬।

৫৭। ঐ, খণ্ড ২, পৃঃ নং ৪৬৩।

৫৮। ঐ, খণ্ড ২, পৃঃ নং ৩৮৬।

৫৯। ঐ, খণ্ড ২, পৃঃ নং ৩৯৬।

৬০। ঐ, খণ্ড ২, পৃঃ নং ৪১৪, ৪৮৭।

৬১। ঐ, খণ্ড ২, পৃঃ নং ৪৫৪।

৬২। ঐ, খণ্ড ২, পৃঃ নং ৯১০।

৬৩। ডঃ গোলাম হুসাইন ইফসুফী; দারসে জেন্দেগী, পৃঃ নং ৪৩- ৪৪।

৬৪। প্রাগুক্ত; আসরারুত্ তাওহীদ, পৃঃ নং ২১০।

৬৫। মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী; মাসনাভয়ে মা'নাভী, দাফতার- ২, লাইন নং ১৪৬১- ১৪৬২।

৬৬। আবু হাইয়ান তাওহীদী; কিতাবুল ইমতায়ি ওয়াল মুয়ানিসাহ্, খণ্ড ২, পৃঃ নং ১২১ ।

৬৭। প্রাগুক্ত; মাসনাভীয়ে মা'নাভী, দাফতার- ২, লাইন নং ১৮৭৮- ১৮৮৯।

৬৮। ঐ, দাফতার- ২, লাইন নং ১৭৬০- ১৭৭০।

৬৯। প্রাগুক্ত; আসরারুত্ তাওহীদ, পৃঃ নং ২০৯।

৭০। ডঃ রেযা এনযাবী নিযাদ; গুযিদেয়ে কাশফুল আসরার, পৃঃ নং ৭৪।

৭১। প্রাগুক্ত; নুরুল উলুম, পৃঃ নং ৭৭।- ৮৮

৭২। প্রাগুক্ত; গুযিদেয়ে তাযিকরাতুল আওলিয়া, পৃঃ নং ৪০।

সূচীপত্র: